Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম রহমান মাইশা

রোলঃ 227020138

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম রহমান মাইশা

রোলঃ 227020138

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মৃত্যুর প্রস্তুতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসনিম রহমান মাইশা, আইডিঃ 227020138 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মৃত্যুর প্রস্তুতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তাসনিম রহমান মাইশা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তাসনিম রহমান মাইশা

আইডিঃ 227020138

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

১.ভুমিকা

মৃত্যু আসবেই। এটা এক অবধারিত বিষয়। কেউ তা থেকে পলায়ন করতে পারবে না। এমনকি কার মৃত্যু কখন হবে, কোথায় হবে এ কথাও কেউ জানে না। মৃত্যুর বিষয়টি শুধু আল্লাহই জানেন। তাইতো তিনি বলেন-

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝
'*কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।' (সুরা লোকমান: আয়াত ৩৪)*। মৃত্যু নিশ্চিত, এতে কোনো সন্দেহ না থাকলেও বেশির ভাগ মানুষ এ বিষয়ে উদাসীন। একজন মুসলিমের করণীয় হলো, মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা এবং তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। অনুরূপভাবে দুনিয়াতে থাকতে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই পরপারের পাথেয় সঞ্চয় করা।ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে স্থায়ী নয় কেউ-ই। দুনিয়ার টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে একদিন পাড়ি জমাতে হবে ওপারে। যেখানে বন্ধু হবে না কেউ, হবে না শত্রুও। এই দুনইয়াতে মানুষ যত কিছুর ই মালিক হোক না কেন, তার আনন্দ উপভোগের যত সম্পদ ই থাকুক না কেন;যদি সে আল্লাহ থেকে দূরে থাকে তাহলে সে হতভাগা, সে সর্বদা দুঃখ দুর্দশা ও চিন্তা পেরেশানিতে জর্জরিত। সবকিছু থেকেও যেন কিছুই নেই তার। সৌভাগ্যবান ও তাওফিক প্রাপ্ত বান্দা তো তারাই যারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে।পিঁপড়া যেমন শীতকালের দুর্ভোগ থেকে বাঁচার জন্য গ্রীষ্মকালেই খাবার ও পাথেয় সংগ্রহ করে রাখে মুমিন বান্দাও ঠিক তেমন তারা দুনিয়াতে থাকতেই আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে নেক আমল সংগ্রহ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন -

بَل تُؤثِرونَ الحَياةَ الدُّنيا- وَالآخِرَةُ خَيرٌ وَأَبقى

" বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"
(সুরা আ'লা; আয়াত ১৬ -১৭)
কখন মৃত্যু আসবে, মানুষ জানে না। মানুষ যেন মৃত্যুকে ভুলেই থাকে। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের পেছনে ছুটে চলা দেখলে তো তাই মনে হয়। দুনিয়ায় মানুষের যত কর্ম, সবই সেদিন প্রকাশিত হবে। কোনো কিছু সেদিন আর গোপন থাকবে না। আমরা কেন ভুলে যাই- দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু হয়; সবই আল্লাহপাক দেখেন। মানুষের মনের কথাও আল্লাহপাক জানেন।

মানুষ মানুষকে ফাঁকি দিতে পারে; কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিনকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। এই চিন্তাটুকু মাথায় থাকা জরুরি। পবিত্র কুরআন শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কোটি কোটি মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, বদলে দিয়েছে ভেতর থেকে, খুলে দিয়েছে তাদের সম্ভাবনার দ্বার, দিয়েছে প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত জীবন। এই জীবনের সঙ্গে মৃত্যুও যে জড়িত তাও উল্লেখ আছে আল-কুরআনে ও হাদিসে।

২.মৃত্যুযাতনা

হাদিসে এসেছে- "কোনো প্রাণীর যদি তোমাদের মতো মৃত্যুজ্ঞান থাকতো তবে তোমরা খাওয়ার জন্য কোনো মোটা প্রাণী পেতে না।" চিন্তা করি যদি কারো আঙ্গুল কেটে যায়! কেমন ব্যথা অনুভব হয়। এর কারণ, আঙ্গুলের যে অংশ কেটে গেছে সেখান থেকে রুহ (প্রাণ) বেরিয়ে গেছে। এখান থেকে প্রাণ বেরিয়ে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। এক আঙ্গুল থেকে রুহ বেরোতে যদি এতো কষ্ট হয়, তবে পুরো শরীর থেকে রুহ বেরোতে কতেটা কষ্ট হবে? বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝানো যেতে পারে, যদি কাঁটাবিশিষ্ট একটি ডাল মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে কিছুক্ষণপর তা টেনে বের করা হয়, তবে যতোটা কষ্ট হবে মৃত্যুর সময় মানুষের তটোতা কষ্ট হবে। যেমন জীবিত বকরির চামড়া ছেলা হচ্ছে। হজরত আলি (রা)যখন জিহাদের খুতবা দিতেন, বলতেন, 'মুজাহিদগণ। আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হলে তোমাদের একটুও কষ্ট হবে না। আর যদি ঘরে গিয়ে মরো তবে কাঁচি দিয়ে কাটার চেয়েও বেশি কষ্ট হবে।' অনেক সময় বলতেন, ' ডেকচিতে ভূণা করার চেয়েও বেশি কস্ট হবে।' এজন্য বলা হয় মৃতলোককে মন্দ বলো না।কারন, সে মন্দকাজের পরিণাম ভোগ করেছে।

এর দ্বারা জানা গেলো, মৃত্যুযাতনা অনেক বেশি। হুজুর (সা) মৃত্যুর কঠোরতা সম্পর্কে বলেন-

وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ

" আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে কম হেসে বেশি বেশি কাঁদতে এবং স্ত্রীদের সাথে বিছানায় শুয়ে আনন্দ-ফুর্তি করতে না।"

হজরত সুফিয়ান সাওরি (রহ.) বলেন- 'মৃত্যুফেরেস্তা যখন মানুষের মনের রগ স্পর্শ করে তখন সে লোকদের চিনতে পারে না। তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। দুনিয়ার সবকিছু ভুলে যায়। তখন এতো বেশি কষ্ট হয় যদি তখন মৃত্যুর নেশা ছেয়ে না যেতো তবে পাশের লোকদের ওপর তরবারি চালিয়ে দিতো।'

৩.মৃত্যুযন্ত্রণার সে সময় অটল থাকা বড়ই কঠিন

সাফওয়ান ইবনে সুলাইম রহ. বলেন,

'মৃত্যু হলো মুমিনের জন্য দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তির মাধ্যম। মৃত্যুকে পার করেই দুনিয়ার কষ্ট থেকে মুক্তি। যদিও মৃত্যুর রয়েছে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা। এ কথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।' (আস -সিয়ার: ৫/৩৬৬)

মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা মৃত্যুর কষ্ট ও তার যন্ত্রণাকে হালকা করে। বিশেষ করে যখন মৃত্যুযন্ত্রণার কষ্ট দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় ফেলে দেয়, যখন মৃত্যুযন্ত্রণার কারণে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফিতনার আশঙ্কা করা হয়, তখন এ চিন্তা-ভাবনা কাজে আসে। সুফইয়ান সাওরি রহ. বলেন,

'মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে কঠিন অন্য কিছু আমার কাছে নেই। আমার ভয় হয় যে, না জানি আমার মৃত্যুযন্ত্রণা অনেক কঠিন হয়, অতঃপর আমি তা সহজের জন্য দুআ করব, কিন্তু আমার দুআ কবুল না হলে তো তখন আমি ফিতনায় পড়ে যাব।' (সিফাতুস সাফওয়াহ:৩/১৪৮)

সুফইয়ান রহ. সারা রাত কাঁদলেন। সকাল হলে লোকেরা তাকে প্রশ্ন করল, 'এসবই কি গুনাহের কারণে?' তখন তিনি মাটির একটি ঢিলা নিলেন আর বললেন, 'গুনাহ তো এর চেয়ে হালকা। বরং আমি কাঁদছি খারাপ পরিণতি বা শেষটা মন্দ হওয়ার ভয়ে।'

এই বুঝটাই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় বুঝ। এটি মানুষের সবচেয়ে বড় বুদ্ধির পরিচয়। মানুষ সর্বদা এই ভয়ে থাকবে যে, না জানি মৃত্যুর সময় তার পাপকাজগুলো তাকে না আবার ধোঁকা দেয়। তার মাঝে ও তার উত্তম সমাপ্তির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ইমাম আহমাদ রহ, আবু দারদা রা.-এর সম্পর্কে বর্ণনা করেন, আবু দারদা রা, মৃত্যুর পূর্বে অচেতন হয়ে পড়লেন। চেতনা ফিরে আসার পর তিনি এই আয়াত পড়লেন,

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُم
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

'আমি ঘুরিয়ে দেবো তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে। যেমন তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত করে ছেড়ে দেবো।' (সুরা আনআম; আয়াত ১১০)

এ কারণেই সালাফ গুনাহের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতেন। এই ভয় করতেন যে, না জানি তা আবার তার মাঝে ও তার উত্তম পরিসমাপ্তির মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলেন,

'জেনে রেখো, যার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়গুলো সঠিক রয়েছে, তার মন্দ পরিসমাপ্তি হবে না। যে লোক দেখানোর জন্য কোনো আমল করে না। বরং অন্তর থেকেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের আশায় সকল আমল করে। মন্দ পরিসমাপ্তি তো এমন ব্যক্তির হবে, যার ভেতর-বাইর সমান নয়, যার আকিদা সঠিক নয়, যে অবিরত কবিরা গুনাহ করতে থাকে, বড় বড় গুনাহ সর্বদা তাকে পরাজিত করে রাখে, ভালো কাজের ওপরে সে একেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। একসময় এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু এসে যাবে। তাওবা করার কোনো সুযোগ থাকবে না। সে সংশোধন হওয়ার আগেই তার মৃত্যু এসে যাবে। আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার আগেই তার সাথে মৃত্যুর সাক্ষাৎ হবে। ফলে শয়তান তার শেষ সময়ে তার ওপর সফল হবে এবং সেই ভয়াবহ সময়ে তার ইমান কেড়ে নেবে। আমরা এ অবস্থা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। ' (আল জাওয়াবুল কাফি :২৪৫)

৪.মৃত্যুর স্মরণ

মৃত্যু চিরসত্য। মৃত্যুর কথা শুনলে অন্তর কেঁপে ওঠে। আত্মা শুকিয়ে যায়। আমরা চাই, মৃত্যুর আলোচনা কম হোক। আলোচনা শুরু হলে দ্রুত বন্ধ হয়ে যাক। কিন্তু হে মৃত্যু-পথের পথিক, হে একই গন্তব্যের সফরসঙ্গী, মৃত্যুকে অবহেলা করো না। তোমার সামনে মাত্র অল্প কয়েকটি পদক্ষেপই বাকি। আমরা উমর ইবনে আব্দুল আজিজের দিকে লক্ষ করি, তিনি বলেছেন, 'আমার অন্তর থেকে মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর স্মরণ পৃথক হলে অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। ' (আল আকিবাহ ৩৯)

আশ্চর্য! সত্যিই আমাদের জন্য এটা বড় আশ্চর্যের। তাঁরা উম্মাহর সে অংশ, যাদের অন্তর জীবন্ত, যাদের কর্ণ সদা জাগ্রত। আল্লাহই আমাদের সহায়। মৃত্যুর স্মরণ তাদের অন্তর থেকে মুহূর্তের জন্যও পৃথক হতো না। অথচ, আমরা এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর আলোচনা শুনতে প্রস্তুত নই। কখনো তো এমনও হয় যে, যখন মজলিসে মৃত্যুর আলোচনা হয়, অন্তিম মুহূর্ত নিয়ে কথা হয়, তখন আমাদের অনেকে সেখান থেকে উঠে যায়। এর কারণ কেবলই আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতা, দুনিয়া ও দুনিয়ার অস্থায়ী সুখ-শান্তির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। এটা হয়ে থাকে আখিরাতের আলোচনা থেকে দূরে থেকে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস নিয়ে মত্ত থাকার কারণে। এমনটা হয়ে থাকে আমাদের ওপরে প্রবৃত্তি বিজয়ী থাকলে। আখিরাত থেকে, আখিরাতের আলোচনা থেকে, আখিরাতের স্মরণ থেকে দূরে থাকার ফলে। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলতেন,

أَكْثِرُوا ذِكْرَ النَّارِ فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ

'তোমরা অধিক পরিমাণে মৃত্যুর স্মরণ করো। কারণ, তার গরম প্রচণ্ড। তার গভীরতা অনেক। তার পেটানোর হাতুড়িটি হবে লোহার। ' (আল -হাসান আল- বসরি: ১০৮)

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. অন্তিম মুহূর্তে অচেতন হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলে উঠলেন,

'হায়, আমার সফর এত দীর্ঘ; অথচ আমার পাথেয় কত কম!' (আল আকিবাহ:১৩৩)

মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ বলতেন,

'নিশ্চয়, এই মৃত্যু দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত মানুষদের ভোগ-বিলাস শেষ করে দেয়। সুতরাং তোমরা এমন ভোগ-বিলাস তালাশ করো, যার কোনো মৃত্যু নেই। '(সিফাতুস সাফওয়াহ :৩/২২৪)

যে নিয়ামত ও ভোগ-উপভোগে মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। বলাই বাহুল্য সে নিয়ামত কেবল আখিরাতেই লাভ করা সম্ভব। আর আখিরাতের ভোগ-বিলাস তালাশ করতে হবে আল্লাহ তাআলার দিকে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করে। যথাযথভাবে তাঁর ইবাদত করার মাধ্যমে। যেমনটি আলা ইবনে জিয়াদা রহ. বলেন,

'মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি যেমনি করে দুনিয়ার সকল মায়া-মমতা ভুলে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে। ঠিক তেমনিভাবে তোমরা সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করবে। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করেন। ক্ষমা প্রাপ্তির পর সে যেন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে। আমাদেরও এমনই হতে হবে।' (আল আকিবাহ: ৯০)

আমরা যদি আমাদের এই স্তরে রাখি,নিজেদের আমরা এই অবস্থানে আাড় করাই। তাহলে অবশ্যই আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। অবশ্যই আমাদের আমল সংশোধন হবে। প্রত্যেক সালাত আদায়ের পূর্বে মনে করব এটাই আমাদের জীবনের শেষ সালাত। মনে করব , মৃত্যু খুবই নিকটবর্তী। মৃত্যুর স্মরণ আমাদের সংশোধন করবে। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা দূর করবে।

দুনিয়াকে তুচ্ছ করে দেখব। আখিরাতের চিন্তা-ফিকির অন্তরে গেঁথে নেব। আখিরাতের জন্যই হোক আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা।

ভয় ও আশাকে আমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী করে নেব। আমল ও আস্থা অনুভব করো। কারণ, এই ভয়ের পরেই রয়েছে চিরনিরাপত্তা। এই পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরেই রয়েছে চিরসুখ। এ আমল ও চেষ্টা-সাধনার পরই তো চিরপ্রশান্তি, যার কোনো শেষ নেই।

মুমিনের আজকের ভয় তার জন্য আগামীকালের নিরাপত্তা নিয়ে আসবে। সে যদি এ ভয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, নেক আমল করে, তাহলে এটা তার জন্য আগামীকালের নিরাপত্তা ও সুখ নিয়ে আসবে।

৫.অন্তিম বিদায়ের পর আর ফিরে আসা যাবে না

এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর বিস্তৃত নিয়ামত দান করছেন। সকাল-সন্ধ্যা আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে তাঁর অগণিত নিয়ামত। কিন্তু আমরা আমাদের এই জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছি আমাদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যের বিপরীত করে। এভাবে উদ্দেশ্যের বিপরীত চলতে চলতে একসময় মৃত্যু আসে। তখন আমাদের কেউ কেউ চিৎকার করে করে বলবে,

}رَبِّ ارْجِعُونِ{ ◌ِ

'হে আমার রব, আমাকে আবার দুনিয়াতে ফেরত পাঠান।' (সুরা মুমিনুন :৯৯)

কেন আমাদের ফেরত পাঠানো হবে? কেন আমরা ফিরে আসব? অথচ, আমরা এই দুনিয়াতে অনেক সময়ই পেয়েছি। কেন আমরা এ সময়গুলো দুনিয়া কামানোর জন্যই ব্যয় করে দিলাম? আমরা কি ভুলে কোনো কিছু রেখে গেছি যে, আবার আমরা ফিরে আসব? আমাদের জীবনের এতগুলো বছর অতিবাহিত হলো। আমাদের গাফিলতি ই রয়ে গেল।আমাদের দুনিয়াতে পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন রইলাম। আর এখন চাইছি, দুনিয়াতে ফিরে আসতে?

আমাদের উত্তর হবে, “ হ্যাঁ, আমি ফিরে আসতে চাইব।” যেন...

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

'যেন আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।' (সুরা মুমিনুন :১০০)

কিন্তু আজ আমরা কোথায়? সেদিন আমাদের এমন উপলব্ধি আসবে, এখন কেন আসছে না? আজ আমরা আমল থেকে দূরে কেন? আমাদের হাতে এখন অনেক সময়; তবুও কেন আমরা আমল থেকে দূরে?

৬.দুনিয়াতে আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কী?

মুগিরা ইবনে হাবিব রহ. বলেন,
'আমরা মালিক ইবনে দিনার রহ.-কে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে গেলাম। তিনি বালিশ থেকে মাথা উঠিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ, আপনি জানেন, আমি এই দুনিয়াতে পেট আর লজ্জাস্থানের চাহিদা মেটাবার জন্য বেঁচে থাকতে চাই না।"' (হিলিয়াতুল আওলিয়া : ৩/৩৬১)

আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন। আমাদের আর তাঁদের মধ্যে কত বিশাল পার্থক্য! তাঁরা দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে চাইতেন, আরও বেশি আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর আনুগত্য করার জন্য। আর বর্তমানে আমরা কীসের জন্য বেঁচে থাকতে চাই?

এটা এমন প্রশ্ন, যার উত্তরের প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের দুরবস্থাই এ প্রশ্নের উত্তর। পরিস্থিতিই সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়া বর্তমানে পরিপূর্ণ উদ্ধত হয়েছে। দুনিয়া তার প্রেমিকদের ও দুনিয়াদারকে নিজের গোলাম বানিয়ে নিয়েছে। ... দুনিয়ার মরীচিকা এই তো দেখা যাচ্ছে। আর মানুষ তাকে পাবার জন্য তার পেছন পেছন ছুটছে। তার দরজায় হর-হামেশা দস্তক দিয়ে চলছে। যেন সে এখানে থাকবে চিরকাল।

মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির তাঁর মৃত্যুর সময় অনেক কাঁদছিলেন। এ সময় তাঁকে বলা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তখন তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আদেশ করেছেন, নিষেধ করেছেন, কিন্তু আমি অবাধ্য হয়েছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন; তাহলে আপনি আমার ওপর দয়া করলেন। আর যদি আমাকে শাস্তি দেন; তাহলে আপনি কোনো জুলুমকারী নন। ' (আল জাহরুল ফায়িহ:৯১)

সায়িদ ইবনে মুসায়্যিবকে প্রশ্ন করা হলো, 'এ সকালে কেমন বোধ করছেন?' তিনি বললেন,

'আমি কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি।' (সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৮৩)

মৃত্যু কখন এসে পড়ে, যারা এর খবর জানে না, তাদের প্রত্যেকের ওপর মুয়াজিব হলো, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। কেউ যেন তার যৌবন আর সুস্থতার মাধ্যমে প্রতারিত না হয়। কেননা, বৃদ্ধ মানুষ খুব কমই মারা যায়। যুবকদের মৃত্যুর সংখ্যাই বেশি। বরং অতি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করাটা তো একটা বিরল ঘটনার মতো।

কেউ কি এটা জানে যে, মুত্যু কখন তার ওপর এসে পড়বে? কখন মৃত্যু এসে তার জীবনের ওপর ভয়ংকর থাবা বসাবে? অবশ্যই এর উত্তর হবে, না। তাহলে প্রস্তুত হওয়া চাই সে সময়ের জন্য, যখন রক্ত চলাচল থেমে যাবে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। আর এই পৃথিবী থেকে আখিরাতের দিকে যাত্রা শুরু হবে।

৭.ভেবে দেখি, কেমন ছিল সালাফর অন্তিম মুহূর্তের ভাবনাগুলো

হামিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

*একবার হাসান বসরি রহ. মসজিদে অনেক জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে কাঁদলেন যে, তার দুকাঁধ কাঁপতে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমাদের অন্তর যদি জীবিত থাকত, মানুষের অন্তরে যদি কল্যাণ থাকত, তাহলে তা তোমাদের এমন রাতের ব্যাপারে ক্রন্দন করাতো; যার সকাল হলো কিয়ামতের দিন। সেটা এমন এক রাত, যা তার সকাল দিয়ে অন্তরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। যে সকাল দিয়ে এমন দিনের শুরু হবে সৃষ্টিকুল তার কথা কখনো শোনেনি। সেদিন সবচেয়ে বেশি গোপন কথা ফাঁস হবে। সেদিন সবার চোখই থাকবে ক্রন্দনরত।"' (সিফাতুস সাফওয়াহ: ৩/২৪৩)

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর মৃত্যুর সময় তাঁর গোলাম নাসরকে বললেন, 'আমার মাথাটা মাটির ওপর রাখো।' তখন নাসর কেঁদে ফেলল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন?' সে বলল, 'আমি স্মরণ করছি যে, আপনি সারা জীবন কত প্রাচুর্যের মধ্যে কাটালেন! আর এখন এখানে অপরিচিত দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছেন!' তখন তিনি বললেন, 'চুপ করো! আমি আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করেছি যে, তিনি যেন আমাকে সমৃদ্ধদের মতো জীবন দান করেন এবং দরিদ্রদের মতো মৃত্যুবরণ করান।' অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে কালিমার তালকিন দাও, তোমরা এখন আমার ওপর বাড়াবাড়ি করো না, তাহলে আমি আবার অন্য কথা বলে ফেলব।" (আল আকিবাহ: ১৪৫)

আল্লাহু আকবার ! তাদের চিন্তা-চেতনার পুরোটা জুড়েই ছিল আখিরাত। দুনিয়াকে আখিরাতের বাহন, নেকি অর্জনের খেত এবং উচ্চ মর্যাদায় আরোহণের মাধ্যম মনে করতেন তাঁরা। আর এ কারণেই তাঁরা তাদের সময়কে কাজে লাগিয়ে তার থেকে সর্বোচ্চ ফল সংগ্রহ করেছেন। সর্বক্ষণ তাঁরা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থেকেছেন। তাদের জীবনটা শুধু কল্যাণই কল্যাণময়।হয়েছে তা থেকে দীর্ঘ জীবনের পুরোটাই আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর অনুগত্যের মধ্যে কেটেছে।

মাহদি ইবনে মাইমুন রহ. বলেন,

'আমি হাসসান ইবনে সুফইয়ানকে তার মৃত্যুর সময় দেখলাম, তাকে বলা হলো, "আপনার কেমন লাগছে?" তিনি বললেন, "যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারি, তাহলে তো ভালো।" অতঃপর তাকে বলা হলো, "আপনি কী চান?" তিনি বললেন, "এমন দীর্ঘ একটি রাত, যার

শুরু-শেষের মধ্যে অনেক ব্যবধান। আর আমি এর সকল সময়টুকু আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে তা জীবিত করতে পারি। (হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১১৭)

তাঁরা মৃত্যুর জন্য সর্বদা এমন প্রস্তুত হয়ে থাকতেন, ঠিক যেমন পথিমধ্যে যানবাহনের জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রী প্রস্তুত হয়ে থাকে। গাড়ির জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রী জানে না, কখন তার গাড়ি আসবে; তাই সে গাড়ির অপেক্ষায় থাকে। তাঁরা অনর্থক কাজে সময়ক্ষেপণ করে না। সময় বেশি লাগলেও সেখানে প্রতীক্ষারত থাকে।

মুআজা আল-আদবিয়্যা রহ.। যখন সকাল হতো, তখন তিনি বলতেন, 'এই তো আজকের দিনেই আমি মৃত্যুবরণ করব।' এ বলে তিনি ইবাদতে রত হতেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত আর ঘুমাতেন না। আবার যখন সন্ধ্যা হতো, তখন তিনি বলতেন, 'এই তো আজকের রাতেই আমি মৃত্যুবরণ করব।' এরপর ইবাদতে রত হতেন সকাল পর্যন্ত আর ঘুমাতেন না। (সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/২২)

আবুল মুনজির ইসমায়িল ইবনে উমর রহ. বলেন,

'ওয়ারকা ইবনে উমর ইবনে কুলাইব রহ.-এর মৃত্যুর সময় আমরা তার নিকট গেলাম। তখন তিনি কালিমা পড়ছিলেন, তাকবির দিচ্ছিলেন এবং আল্লাহর জিকির করছিলেন। অতঃপর মানুষের ভিড় যখন বেড়ে গেল, তখন তিনি তার ছেলেকে বললেন, "তুমি আমার পক্ষ থেকে মানুষের সালামের উত্তর দিয়ে দিয়ো, যাতে তারা আমাকে আমার রবের স্মরণে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে। "' (তাজকিরাতুল হুফফাজ :১/২৩০)

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. তাঁর অন্তিম মুহূর্তে। মৃত্যুর পূর্বের এ সময়ে তিনি বলেন,

'আমার প্রিয় আমার কাছে এসেছে আমার এ দরিদ্র অবস্থায়। আজকের পূর্বে আমি তোমাকে ভয় পেতাম, অথচ আজ আমি তোমাকে কামনা করি।(আল আকিবাহ: ১৪৬)

একবার হাসান রহ. খুব করে কাঁদলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আবু সায়িদ, আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন, 'এই ভয়ে কাঁদছি যে, না জানি আমাকে আবার জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। ' (আল জাহরুল ফায়িহ :৯১)

সুলাইমান আত-তাইমি রহ. বলেন,

'আমি আমার এক সাথির নিকট গেলাম। তাকে খুবই অস্থির ও উৎকণ্ঠিত দেখতে পেলাম। তার এই অস্থিরতার কারণে আমারও মন খারাপ হয়ে গেল। তখন আমি তাকে বললাম, "তোমার এই অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার কারণ কী? অথচ আল্লাহর শুকরিয়া যে, তুমি তো ভালো অবস্থায় আছ!" তখন আমার সে বন্ধু বলল, "আমি কেন অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হবো না? অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হওয়া আমার চেয়ে অধিক আর কার জন্য যথার্থ? আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে যদি ক্ষমা করেও দেওয়া হয়। তবুও আমি এই চিন্তায় লজ্জিত হচ্ছি যে, আমি কী নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হবো!"" (তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব :৮৮)

আল্লাহু আকবার। তারা আল্লাহ তাআলাকে যথাযথভাবে চিনতে পেরেছিলেন। যথাযথভাবে তাঁর মূল্যায়ন করেছিলেন। তাই তো তারা নিজেদের গুনাহের কারণে লজ্জিত হতেন, পদস্খলনের কারণে লজ্জা পেতেন। তাদের চিন্তা- চেতনার পুরোটা জুড়েই ছিল আখিরাতের চিন্তা। আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের আশাও ছিল প্রবল। তাদের হৃৎপিণ্ডের সাথে মিশে গিয়েছিল এই আয়াত,

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ

سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

'আর যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, এমন লোকদের চেষ্টা-সাধনা স্বীকৃত হয়ে থাকে।' (সুরা ইসরা:১৯)

আল্লাহকে পাওয়ার আশা তাদের আরও সামনে তাড়িয়ে নিত। তাদের অন্তরে পদস্খলনের ভয়ও বিরাজ করত।

রাবি ইবনে খুসাইম রহ.। তিনি অসুস্থ হলে লোকেরা তাকে বলল, 'আপনার জন্য কি আমরা ডাক্তার ডাকব না?' কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন,

'আদ জাতি, সামুদ জাতি ও আসহাবুর র'সরা কোথায়? তাদের মধ্যবর্তী সময়ে ও আগে-পরে কত মানুষ এসেছে, কোথায় তারা? তারা তো চলে গেছে। অথচ তাদের নিকট ওষুধও ছিল, ডাক্তারও ছিল। আমি তো কোনো চিকিৎসককেও চিরজীবী হতে দেখি না, আবার কোনো

চিকিৎসা- প্রাপ্ত মানুষও সারা জীবন বেঁচে থাকে না। প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট একটা সময় আসে, যখন সে চলে যায়। ' (আল আকিবাহ : ১১৯)

যখন মানুষের ফয়সালার সময় হয়, তখন কোনো চিকিৎসা তার কাজে আসে না। আল্লাহ তাআলা বলেন

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ . وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ

'কক্ষনো না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। এবং বলা হবে, কে তাকে রক্ষা করবে? সে মনে করবে, দুনিয়া হতে বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে। সেদিন আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। ' (সুরা কিয়ামাহ : ২৬-২৮)

একজন সাহাবীর অন্তরের আহ্বান : আবু দারদা রা. অন্তিম মুহূর্তের সে সময়টিতে বলতে শুরু করলেন

'কোনো লোক কি নেই, যে আমার মতো

এমন পতনের সময়ের জন্য আমল করবে? কেউ কি নেই, যে আমার এই সময়ের মতো সময়ের জন্য আমল করবে? কেউ কি নেই, যে এই দিনের মতো দিনের জন্য আমল করবে? এ বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, "আপনি কাঁদছেন? অথচ আপনি রাসুলুল্লাহ-এর সাহাবি!" উত্তরে তিনি বললেন, "আমি কেন কাঁদব না? আমি তো জানি না যে, আমার গুনাহের কারণে আমাকে কোথায় নিক্ষেপ করা হবে?""

এমন নিষ্ঠাপূর্ণ আহ্বানের সাড়া কোথায়, যা মুমিনের অন্তরকে নাড়িয়ে দেওয়ার কথা? এমন নিষ্ঠাপূর্ণ আহ্বানের সাড়া কোথায়, যা প্রত্যেক মানুষের নিকট আগুয়ান একটি মুহূর্তকে স্মরণ করিয়ে দেয়? নিশ্চয় তা এমন মুহূর্ত, উদাসীনতা যাকে আড়াল করে রেখেছে। কালক্ষেপণ যার ওপর পর্দা টেনে দিয়েছে। ফলে আশা অনেক দীর্ঘ হয়েছে। আর আমল অনেক কমে গেছে। দূরবর্তী হয়ে গেছে তাওবার সকাল।

৮.শিক্ষা গ্রহণ করা চাই অপরের মৃত্যু দেখে

আমরা যদি একবার আমাদের মৃত্যুর সময়ের অবস্থা দেখতে পেতাম! তবে অবশ্যই সচেতনতা অবলম্বন করতাম। কিন্তু তা তো একবারই আসে। তবুও, আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে এই সুযোগ দিয়েছেন, আমরা আমাদের আগে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। দেখব, তাদের শেষ অবস্থা কেমন হয়েছে, তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা কতটা কঠিন ছিল। আমাদের সময় তো একেবারেই কম। আমরা অল্প সময়ই বেঁচে থাকবে। অচিরেই আমাদের সে সময় আসছে। তাই তাদের অবস্থার দিকে তাকাব এবং শিক্ষা গ্রহণ করব।

সুলাইমান আত-তাইমি রহ.-এর যখন অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল, তখন তাকে বলা হলো, 'সুসংবাদ গ্রহণ করুন, কেননা আপনি তো অনেক পরিমাণে আল্লাহর আনুগত্য করতেন।' তখন তিনি বললেন, 'তোমরা এমন বলো না। কারণ, আমি জানি না যে, আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কী ফায়সালা করা হবে।' কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ◌َ

'সেখানে আল্লাহর নিকট থেকে তারা এমন কিছুর সম্মুখীন হবে, যা তারা কখনো অনুমানও করেনি। '(সুরা যুমার : ৪৭)

কোনো এক সালাফ বলেছেন,

'তারা অনেক কাজকেই নেকির কাজ মনে করে করবে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা সেগুলোকে মন্দ কাজ হিসেবে দেখতে পাবে।'
উম্মে দারদা রা. বলেন,

'কেউ যখন উত্তম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করত, তখন আবু দারদা রা. বলতেন, অভিনন্দন তোমাকে। হায়, আমি যদি তোমার স্থানে থাকতাম। আমি এ ব্যাপারে তাঁকে কিছু বললে তিনি বলতেন, "হে অবুঝ স্ত্রী, তুমি কি জান না, মানুষ সকালে মুমিন থাকবে আবার বিকেলে মুনাফিক হয়ে যাবে? তার থেকে ইমান কেড়ে নেওয়া হবে; অথচ সে টেরও পাবে না। এ কারণেই আমি সালাত-সিয়ামের ওপর বেঁচে থাকার চেয়ে এই লোকটির মৃত্যু দেখে ঈর্ষা করছি।' (শারহুস সুদুর :১১)

আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট এই দ্বীনের ওপর অটল থাকার তাওফিক চাই। কেননা, মানুষ হিদায়াতের পথ পরিত্যাগ করে বাতিলের পথ অবলম্বন করছে, এই সংবাদ তো আমরা প্রতিনিয়তই পাচ্ছি। এমন এমন সংবাদও শুনছি, যা শরীরের লোম দাঁড় করিয়ে দেয়। চিন্তাকে বিহ্বল করে দেয়। আর সবচেয়ে কঠিন ফিতনা ও সবচেয়ে বড় মুসিবত তো এটাই যে, মানুষ হিদায়াতের পথ ছেড়ে বাতিলের পথে চলে যায়, জান্নাতের পথ পরিত্যাগ করে জাহান্নামের পথ অবলম্বন করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ অবস্থা থেকে হিফাজত করুন এবং মুসলিম অবস্থায় জীবিত রেখে মুমিন অবস্থায় মৃত্যু দান করুন।

ইবনে মুনকাদির রহ. মৃত্যুর সময় কাঁদতে লাগলেন, তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন,

'আল্লাহর শপথ, আমি এমন কোনো গুনাহের কারণে কাঁদছি না, যা আমি জেনেশুনে করেছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমি এমন কোনো কাজ করেছি, যা আমার কাছে ভালোই মনে হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট তা গুরুতর অপরাধ। ' (আস সুবাত ইনদাল মামাত : ৯৪)

আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় এর মধ্যে অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু আফসোস, আমরা আমাদের পিতা-মাতা, অত্মীয়-স্বজনদের দেখি যে, কীভাবে তারা মাটিকে বিছানা বানিয়েছেন, তাদের কবরের ওপর মাটি ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের একটি নির্জন সংকীর্ণ গর্তের মধ্যে রেখে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে! কিন্তু আমরা এ নিয়ে একটুও চিন্তা করি না। একবারও ভাবি না যে, আমাদেরও তো এদিকেই যেতে হবে। এ পথেই চলতে হবে। এই রাস্তা, এই ঘাঁটি অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে।

হাসান বসরি রহ. মৃত্যুর সময় কাঁদতে কাঁদতে বললেন,

'আত্মা দুর্বল। বিষয়টি অনেক ভয়ংকর। নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব।'

চোখদুটি বন্ধ করে ভাবি কিছুক্ষণ

একটু বসি। চোখদুটি বন্ধ করে একটু ভাবি। আমার মৃত্যুর সময় হয়েছে। মৃত্যুর ফেরেশতা আমার দরজায় আমার খোঁজ করছে। সে আমার জান কবজ করবে। আমাকে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। কি, ভয় হচ্ছে?

হ্যাঁ, মৃত্যু যখন আসবে, তখন এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে পারব। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা ভয় পেয়ে যাবে, সবকিছু ভুলে কেবল মৃত্যু নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর এটা তো হবে দুনিয়ার অবস্থা, মৃত্যুর পূর্বের অবস্থা। আর বিষয়টি ঘটবেই, মৃত্যু আসবেই। আমাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের আঙিনায় মৃত্যু নেমে এসেছে। আমাদের আঙিনায়ও মৃত্যু নেমে আসবে। আমাদের সকলকেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। এই দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে মনে কোনো ধারণা আছে কি? এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি কি? কীভাবে নিয়েছি প্রস্তুতি? আল্লাহর সামনে সেই দণ্ডায়মান হওয়াটা হবে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর। তখন আমাদের প্রতিটি সময় প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব নেওয়া হবে। হিসেব নেওয়া হবে আমাদের প্রতিটি ভালো কাজ ও মন্দ কাজের। এমনভাবে হিসেব নেওয়া হবে, অণু পরিমাণ কোনো কিছুই বাদ পড়বে না। সবকিছুই হিসেবের আওতায় আসবে। কমও করা হবে না. বেশিও আনা হবে না। আমলনামায় যতটুকু আছে ঠিক ততটুকুই।

ইবনে হাজিম রহ. কে প্রশ্ন করা হলো, 'আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় মানুষের অবস্থা কেমন হবে?' তিনি বলেন,

'আল্লাহর অনুগত বান্দার উপস্থিতিটা হবে, পরিবার থেকে দূরে থাকা এমন লোকের মতো, যার আগমনের জন্য পরিবারের সকলে আগ্রহী। আর আল্লাহর অবাধ্য বান্দার অবস্থা হবে পলায়নকারী গোলাম তার ক্রুদ্ধ মালিকের নিকট ফিরে আসার মতো।'

আমাদের উচিত আলা ইবনে গাদাবি রহ.-এর নিম্নের বাণীটি নিয়ে একটু চিন্তা করা। তিনি বলেন,

'তোমরা প্রত্যেকে নিজেকে এমন ব্যক্তির অবস্থানে রাখবে, যার মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। সে আল্লাহ তাআলার নিকট ইবাদতের জন্য কিছু সময় চেয়েছে আর আল্লাহ তাআলাও তাকে কিছু সময়ের জন্য সুযোগ দিয়েছেন। সে সময়টুকুতে সে যেভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর কাছে নিজের কৃত ভুলের জন্য তাওবা করবে। তুমিও ঠিক তার মতোই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করো এবং তাঁর কাছে তাওবা করো। ' (হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/২৪৪)

বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে নিজেকে অপরাধীর নাম দিয়েছে। তাকে বলা হলো, আপনার অবস্থা কী? উত্তরে তিনি বললেন,

'সে ব্যক্তির অবস্থা কেমন হতে পারে, যে দীর্ঘ সফরে যেতে চায়, কিন্তু তার কোনো উপায়-উপকরণ নেই। সে কোনো সঙ্গী ছাড়াই একাকী কবরে প্রবেশ করবে। এক ন্যায়পরায়ণ বাদশার সামনে নিজের পক্ষের কোনো দলিল ছাড়াই দণ্ডায়মান হবে। ' (আল ইহইয়া : ২/ ২৫১)

জনৈক সালাফ বলেন, 'আতা আস-সুলামি মুমূর্ষু অবস্থায়। এ রোগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে সময় আমি তাকে দেখতে গেলাম। আমরা তাকে বললাম, "আপনার কী অবস্থা?" তিনি বললেন,

"মৃত্যু আমার কাঁধের ওপর। কবর আমার সামনে। কিয়ামত আমার থামার স্থান। জাহান্নামের ওপরে সেতু হয়ে এগিয়ে গিয়েছে আমার রাস্তা। আমি জানি না, আমার কী হবে?"

এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে অচেতন হয়ে গেলেন। যখন তার জ্ঞান ফিরল, তিনি আবার বলতে শুরু করলেন,

“হে আল্লাহ, আপনি আমার ওপর দয়া করুন। মৃত্যুর ভয়াবহতা থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কবরে একাকী থাকার সময় আমার ওপর দয়া করুন। হে দয়াময়, আপনার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার সময় আমার ওপর রহম করুন।""

মৃত্যু সমাগত। মৃত্যুযন্ত্রণা সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ। অথচ আমরা উদাসীন রয়েছি! এখন মৃত্যু নিয়ে মানুষ কথা বলে না। মৃত্যু নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করে না। তারা এ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে রয়েছে। কখনো কখনো যদিও মৃত্যুর আলোচনা করেও; তবুও তা তাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে হয় না। বরং তা হয় দুনিয়ার কামনা ও ব্যস্ততার পঙ্কিলতায় ভরপুর মন নিয়ে। ফলে এ আলোচনা অন্তরের মাঝে কোনো আবেদন সৃষ্টি করে না। হৃদয়ের গভীরে কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না। কোনো পরিবর্তন আনে না মানুষের জীবনে।

অন্তরে আল্লাহর ভয় ও মৃত্যুর ভয় প্রবেশের মাধ্যম হলো, অন্তর থেকে দুনিয়ার সকল চিন্তা বের করে শুধু আখিরাত ও মৃত্যুর চিন্তা করতে হবে। মৃত্যু তো তার একেবারে সামনে। মৃত্যুর চিন্তায় সর্বদা চিন্তিত ও ভীতসন্ত্রস্ত থাকতে হবে। ঠিক যেমন নির্জন ভয়ংকর প্রান্তর অতিক্রমকারী মুসাফির সর্বদা বিপদের ভয় করতে থাকে। অথবা সমুদ্রে ভ্রমণকারী লোকের মতো যে সর্বদা তার সফর নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অন্য কোনো চিন্তা তার মধ্যে প্রবেশ করে না। (আল ইহইয়া: ৪/৪৭৯)

অথবা এ ক্ষেত্রে সমাধান হতে পারে, হাসান বসরি রহ.-এর মতো হওয়ার মাধ্যমে। হাসান বসরি রহ. এক লোককে তার মৃত্যুসজ্জায় দেখতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি মৃত্যুর যন্ত্রণা কাছ থেকে দেখলেন। বাড়ি ফিরে তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। বাড়ি থেকে যে অবস্থায় বের হয়েছিলেন, এখন আর তিনি সে রকম নেই। তিনি খাওয়া-দাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেলেন। পরিবারের লোকেরা তাকে বলল, 'আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। অন্তত খাবারটুকু তো গ্রহণ করুন।' তখন তিনি বললেন, 'হে পরিবারের লোকেরা, তোমরা তোমাদের খানাপিনা নিয়ে থাকো। আল্লাহর শপথ, আমি এমন মৃত্যু দেখেছি! আমি তার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকব, যতক্ষণ না আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি।'(আত তাজকিরাহ : ১৪)

৯.মৃত্যু সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আলোচনা

সর্বশক্তিমান ও পরম কৌশলী আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্বীয় কিতাব কুরআনুল কারীমে মৃত্যু ও মৃত্যু বিষয়ক আলোচনা করেছেন- সর্বমোট ১৬৫ বার। এত বিশাল আলোচনার জন্য যতখানি বৃহত্তর পরিসরের দরকার, তার সংস্থান বর্তমান এই ক্ষুদ্র ও সীমিত পরিসরে নেই। এজন্য আমরা মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে 'মৃত্যু' শব্দটির আল কুরআনে শুধু মাত্র একবচনে ব্যবহৃত আয়াতগুলো উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাব। এ দিকে লক্ষ্য করা যাক।

আল-কুরআনে 'মউত' (মৃত্যু) শব্দের ব্যবহার আরবী 'মউত (মৃত্যু) শব্দটি একবচন। একবচনে মউত শব্দটি আল-কুরআনে সর্বমোট ৩৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে। মউত বা মৃত্যুর স্বরূপ বুঝতে হলে আল- কুরআনের এই ৩৫টি আয়াতের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হতে হবে।

নিম্নে এই আয়াতসমূহের বাংলা তরজমা উপস্থাপন করা হল।

১. কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে তারা কর্ণে অঙ্গুলী প্রবেশ করায়, আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৯, পারা ১, রুকু-২)

(এই আয়াতে 'হাজারাল মাউত' অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ে কথাটির দ্বারা মৃত্যুকে ভয় করার কথা তুলে ধরা হয়েছে। শুধু ভয়ংকর কিছু দেখলেই নয়, বরং এমনিতেও মৃত্যুকে ভয় করা ঈমানদারদের কর্তব্য হওয়া উচিত।

২. বল, যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
(সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৪, পারা ১, রুকু-১১)

এই আয়াতের আলোকে বুঝা যায় যে, পরকালের
সুখের নিবাস মৃত্যুর পরেই লাভ করা যাবে। তাই মৃত্যু কামনা করা ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং মৃত্যুর কথা চিন্তা করা বিশ্বাসী বান্দাদের একটি বিশেষ গুণ। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিগণ কখনও মৃত্যু চিন্তা হতে গাফেল থাকেন না।

৩. ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? যখন সে পুত্রগণকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে?...।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৩৩, পারা ১, রুকু-১৬)।

এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত্যুর পূর্বে আপনজনদেরকে অসিয়ত করা, উপদেশ দেয়া অতি উত্তম কাজ।

৪. তোমাদের মধ্যে কারোও মৃত্যু কাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন সম্পত্তি রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগ প্রথা মতো তার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অসীয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হল, তা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৮০, পারা ২, রুকু-২২)।

৫. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা উহা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা' স্বচক্ষে দেখলে।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৪৩, পারা ৪, রুকু-১৪)।

৬. যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হতো না। তাদেরকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৬৮, পারা ৪, রুকু- ১৭১)।

৭. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে; যাকে অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে-ই সকলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৮৫, পারা ৪, রুকু- ১৯)।

৮. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্যে হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন।

(সূরা নিসা: আয়াত ১৫, পারা ৪, রুকু- ৩১)।

৯. তাওবাহ তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দকার্য করে এবং তাদের কারোও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, আমি এখন তাওবাহ করছি এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়, এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।

(সূরা তাওবাহ: আয়াত ১৮, পারা ৪, রুকু-৩)।

১০. তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করলেও

(সূরা নিসা: আয়াত ৭৮, পারা ৫, রুকু- ১১)।

১১. কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে এবং কেউ আল্লাহ ও রাসুলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ হতে মুহাজির হয়ে বের হলে এবং তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা নিসা: আয়াত ১০০, পারা ৫, রুকু- ১৪)।

১২. হে মুমিনগণ! তোমাদের কারোও যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্যে হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।

(সূরা মায়িদাহ: আয়াত ১০৬, পারা ৭, রুকু-১৪)।

১৩. তোমরা সফরে থাকলে এবং মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্যে হতে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে।

(সূরা মায়িদাহ: আয়াত ১০৬, পারা ৭, রুকু- ১৪)।

১৪. তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রম শালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন, অবশেষে যখন তোমাদের কারোও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না।

(সূরা আনয়াম: আয়াত ৬১, পারা ৭, রুকু ৮)।

১৫. যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে তোমাদের প্রাণ বের কর........।

(সূরা আনয়াম: আয়াত ৯৩, পারা ৭, রুকু- ১১)।

১৬. সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে, আর তারা যেন উহা প্রত্যক্ষ করছে।

(সূরা আনফাল: আয়াত ৬, পারা ৯, রুকু- ১)।

১৭. মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে তুমি তা বললেই কাফেরগণ নিশ্চয়ই বলবে এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।

(সূরা হুদ: আয়াত ৭, পারা ১২, রুকু- ১)।

১৮. যা সে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং তা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে, সর্বদিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা। কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।

(সূরা ইব্রাহীম: আয়াত ১৭, পারা ১৩, রুকু- ৩)।

১৯. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে........

(সূরা আম্বিয়া: আয়াত ৩৫, পারা ১৭, রুকু- ৩)।

২০. যখন তাদের কারোও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর।

(সূরা মুমিনুন: আয়াত ১৯, পারা ১৮, রুকু- ৬)।

২১. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী, তারপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

(সূরা আনকাবুত: আয়াত ৫৭, পারা ২১, রুকু- ৬)।

২২. বল, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণহরণ করবে, পরিশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।

(সূরা সাজদাহ: আয়াত ১১, পারা, ২১, রুকু- ১)।

২৩. বল, তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

(সূরা আহযাব: আয়াত ১৬, পারা ২১, রুকু- ২)।

২৪. তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতা বশতঃ যখন বিপদ আসে, তখন তুমি দেখবে, মৃত্যুর ভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো চক্ষু উলটিয়ে তারা তোমার দিকে চেয়ে আছে ....।

(সূরা আহযাব: আয়াত ১৯, পারা ২১, রুকু- ২)।

২৫. যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জ্বিনদেরকে তাঁর মৃত্যু বিষয় জানাল কেবল মাটির পোকা, যা সুলায়মানের লাঠি ভক্ষণ করেছিল।

(সূরা সাবা: আয়াত ১৪, পারা ২২, রুকু-২)।

২৬. আল্লাহই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণ ও নিদ্রার সময়; তারপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলো রেখে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

(সূরা যুমার: আয়াত ৪২, পারা ২৪, রুকু-৪)।

২৭. *নিশ্চয়ই তারা বলে থাকে যে, আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হব না।*

(সূরা দুখান: আয়াত ৩৫, পারা ২৫, রুকু-২)।

২৮. মুমিনরা বলে, একটি সূরা অবতীর্ণ হয়না কেন? তারপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং এতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে, তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা মৃত্যু ভয়ে বিহ্বল মানুষের মতো তোমার দিকে তাকাচ্ছে, তাদের পরিণাম খুবই শোচনীয়।

(সূরা মোহাম্মদ: আয়াত ২০, পারা ২৫, রুকু-৩)।

২৯. মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসবে, ইহা হতেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছো।

(সূরা ক্বাফ: আয়াত ১৯, পারা ২৬, রুকু-২)

৩০. আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই।
(সূরা ওয়াকিয়া: আয়াত ৬০, পারা ২৭, রুকু- ২)।

৩১. বল, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাত হবেই, তারপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।

(সূরা জুমুয়া: আয়াত ৮, পারা ২৮, রুকু-১)।

৩২. আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তোমরা তা হতে খরচ করবে তোমাদের কারোও মৃত্যু আসবার পূর্বে ....

(সূরা মুনাফিকুন: আয়াত১০, পারা ২৮, রুকু- ২)।

৩৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।

(সূরা মুলক: আয়াত ২, পারা ২৯, রুকু-১)।

৩৪. তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা মৃত্যু ভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ বলেছিলেন, তোমাদের মৃত্যু হোক, তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৪৩, পারা ২, রুকু ৩২)।

৩৫. বল হে ইহুদিগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠি নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(সূরা জুমুয়া: আয়াত ৬, পারা ২৮, রুকু- ১)।

১০.মৃত্যু এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি বিষয়ে কতিপয় হাদিস

ইসলামে এ বিষয়ে অনেক হাদিস পাওয়া যায়। এগুলো মুমিনদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার উৎস। এখানে মৃত্যুর বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের একটি সংকলন দেওয়া হলো:

---

১. মৃত্যু অবধারিত

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"*তোমরা দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তোমরা একজন পথিক বা পথের মুসাফির।*"
(সহীহ বুখারি: ৬৪১৬)

তিনি আরও বলেছেন:
"*মৃত্যু যখন আসবে, তখন তা থেকে কারও পরিত্রাণ নেই।*"
(তিরমিজি: ২২৮৯)

---

২. বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"*তোমরা বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করো, যা সকল আনন্দকে ধ্বংস করে দেয়।*"
(তিরমিজি: ২৩১৭; নাসায়ি: ১৮৪৪)

---

৩. মৃত্যু থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন:
"*যে প্রাণই রয়েছে, তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।*"

(সহীহ বুখারি: ১৩৮৩; কুরআন: সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)

---

৪. মৃত্যু আখিরাতের দরজা

রাসূল (সা.) বলেছেন:
"*মৃত্যু মুমিনের জন্য আখিরাতে প্রবেশের দরজা এবং দুনিয়ার ক্লান্তি থেকে মুক্তি।"*
(সহীহ মুসলিম: ২৮৭২)

---

৫. মৃত্যু প্রতিরোধ করার উপায় নেই

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন:
"*যদি কেউ মৃত্যুর ভয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়, তবুও মৃত্যু তাকে পাবে।"*
(মুসনাদে আহমদ: ১৭৮৮৩)

---

৬. মৃত্যু সময়ের পূর্বাভাস

মৃত্যুর সময় এবং স্থান সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"*কেউ জানে না কোথায় সে মারা যাবে এবং কখন মারা যাবে।*"
(কুরআন: সূরা লোকমান: ৩৪)

---

৭. নেককার মৃত্যু কামনা

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন:
"*তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও এবং দোয়া করো, যাতে তোমাদের মৃত্যু ঈমানের উপর হয়।*"
(তিরমিজি: ৩৪৯১)

---

৮. মৃত্যুর পর পাপ বন্ধ হওয়া

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"*মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস চালু থাকে: সদকা জারিয়া, শিক্ষামূলক জ্ঞান এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।*"
(সহীহ মুসলিম: ১৬৩১)

---

৯. মৃত্যু কষ্টের সময়কার অবস্থা

রাসূল (সা.) বলেছেন:
"*মৃত্যুর সময় একজন মুমিনের আত্মা সহজেই বের হয়, কিন্তু কাফিরদের আত্মা কঠিনভাবে বের হয়।*"
(সহীহ বুখারি: ৬৫১২; মুসলিম: ২৮৭০)

---

১০. জান্নাত বা জাহান্নামের অবস্থান মৃত্যুর পর জানা যায়

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"*কবর মুমিনের জন্য জান্নাতের একটি বাগান, আর কাফিরের জন্য জাহান্নামের একটি গর্ত।*"
(তিরমিজি: ২৪৬০)

---

১১. জান্নাতের সুসংবাদ শুনলে মৃত্যু সহজ হয়

রাসূল (সা.) বলেছেন:
"*মুমিন যখন মৃত্যুর সময় জান্নাতের সুসংবাদ শুনে, তখন তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে যায় এবং মৃত্যু সহজ হয়ে যায়।*"
(সহীহ বুখারি: ৬৫০৫)

---

১২. মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"*সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।*"
(ইবনে মাজাহ: ৪২৫৯)

---

১৩. মৃত্যুর কষ্ট

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"*আমি মৃত্যু কষ্ট অনুভব করেছি এবং এটি অত্যন্ত কঠিন।*"
(সহীহ বুখারি: ৪৪৪৯; মুসলিম: ৪৩৯৩)

---

১৪. দুনিয়া থেকে বিদায়ের উপদেশ

রাসুল (সা.) তাঁর বিদায়ের আগে উম্মতকে নসিহত করেছেন:
"*তোমরা নামাজকে গুরুত্ব দাও এবং তোমাদের অধীনস্তদের প্রতি ভালো ব্যবহার করো।*"
(আবু দাউদ: ৫১৫৬)

মৃত্যু সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা হলো এটি জীবনের অপরিহার্য বাস্তবতা। প্রতিটি মুমিনের উচিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করা। মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে পাপ থেকে বিরত থাকা সহজ হয় এবং নেক আমল করার আগ্রহ বাড়ে।

১১.মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ

প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের স্পর্শ করবেই’ (সুরা নিসা : আয়াত ৭৮)।

তবে ইসলাম মৃত্যু কামনাকে বৈধ মনে করে না। নবী করিম (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যেন কিছুতেই মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে তার জন্য দোয়াও না করে। কেননা যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিনের দীর্ঘ জীবন শুধু তার জন্য কল্যাণই বয়ে আনে।’ (মুসলিম : হাদিস ৬৯৯৫)

মুমিন কখনো মৃত্যুকে ভয় করবে না বরং মৃত্যুকে স্মরণ করবে। ইসলাম মৃত্যুকে ভয় না করে মৃত্যুর স্মরণ ও পরবর্তী জীবনের পরিণতি চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সেসব মানুষের নিন্দা করেছে যারা মনে করে মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই। নবীজি (সা.) বলেন, ‘তোমরা জীবনের স্বাদ ধ্বংসকারীকে (মৃত্যু) বেশি পরিমাণে স্মরণ করো’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৩০৬)। রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, ‘মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।’ (মুস্তাদরিক আলাস সাহিহাইন : হাদিস : ৮৯৪৯)

আল্লাহর ভয়েই তারা এমনটি ভাবতেন :

আবু সুলাইমান আদ-দারানি রহ. বলেন, 'আমি আবিদা উম্মে হারুনকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি মৃত্যুকে পছন্দ করেন?"

তিনি বললেন, "না।"

আমি বললাম, "কেন?"

তিনি উত্তর করলেন, “আল্লাহর শপথ, আমি যদি কোনো মাখলুকের অবাধ্য হই, তবে তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করি।... তাহলে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে কীভাবে সাক্ষাতের সাহস করতে পারি?""" (আল আকিবাহ :৩০)

শুমাইত ইবনে আজলান বলেন,

'এ পৃথিবীতে মানুষ দুপ্রকার, এক. দুনিয়া থেকে পাথেয় সংগ্রহকারী। দুই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত বা দুনিয়াঅর্জনকারী। সুতরাং ভেবে দেখি, আমরা এ দুপ্রকারের কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত? আমরা কি আল্লাহর আনুগত্য পালন, ভালোভাবে তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করা এবং নেক আমলের মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য এটা চাই? যদি আমাদের চাওয়া এ উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, তবে আমাদের জন্য সুসংবাদ। না আমরা খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা, আনন্দ-ফুর্তি আর স্ত্রী-সন্তানদের সাথে উপভোগের জন্য, দুনিয়া কামানোর জন্য দীর্ঘ সময় দুনিয়াতে থাকতে চরি? তবে তো আমাদের এই দীর্ঘায়ু কামনা কতই না নিকৃষ্ট।'

আমাদের তো ওই দুনিয়াবিমুখের কথার মতো হওয়া উচিত, যিনি বলেছেন,

'প্রতিটি মৃত ব্যক্তির অবস্থার মধ্যে আমাদের জন্য নসিহত রয়েছে। আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে তার প্রত্যাবর্তন নিয়ে চিন্তা-ভাবনায়। ' (আল আকিবাহ :৪৩)

হামিদ আত-তাবিল রহ. দীর্ঘ সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করলেন, লোকেরা তাঁর অবস্থা ইবনে আওন রহ.-কে বলল। ইবনে আওন বললেন, 'হামিদ ভবিষ্যতের জন্য যা পাঠিয়েছে তার মুখাপেক্ষী সে। ' (তাজকিরতুল হুফফাজ: ১/ ১৫২)

আমালনামা খোলা থাকতেই আমল করে নেয়া

মানুষের আমলনামা তার মৃত্যু পর্যন্ত লেখা হয়। মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমলনামা হিসেবের জন্য গুটিয়ে রাখা হয়। সুতরাং আমাদের আমলনামা এখন খোলা। তাতে আমল লেখা হচ্ছে। কিন্তু তাতে কী লেখা হচ্ছে? সেখানে কি নেক আমল, মাকবুল ইবাদত লেখা হচ্ছে? না লেখা হচ্ছে অন্য কিছু? আমাদের কেউ যদি খাতা-কলম নিয়ে নিজের একটি ঘণ্টার সমস্ত কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করে রাখে, তারপর সেটা আবার পড়ে দেখে; তবে সে তার অবস্থা জানতে পারবে এবং জীবিত অবস্থায় নিজের আমলনামা দেখতে পাবে।

এতে করে হয়তো সে তার পদস্খলনগুলো ঠিক করতে পারবে। ফিরে আসতে পারবে তার ভ্রষ্টতা থেকে। এবং তাওবা করে উত্তমরূপে নেক আমল করতে পারবে।

পার্থিব বিষয় নিয়েই সারাক্ষণ চিন্তায় ডুবে থাকে, দুনিয়া নিয়ে মাথা কুটে কুটে মরে- আমাদের চারপাশে এমন লোকের সংখ্যা অসংখ্য-অগণিত। কী করে এক টাকাকে দুই টাকা বানানো যায়? একটা বাড়িতে হয় নাকি? কীভাবে আরেকটা বাড়ি নির্মাণ করা যায়? এককথায় দুনিয়ার

প্রতিটি বিষয়ে কীভাবে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়? এসবই তাদের মাথায় সব সময় ঘুরঘুর করে।

কিন্তু পরকাল নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। চিন্তা-ফিকির করার সময়ও নেই। আখিরাতের কামিয়াবি অর্জনের জন্য নেই কোনো পরিকল্পনা। কীভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব, কীভাবে জান্নাতের এক স্তর থেকে আরও উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারব- এসব চিন্তা তাদের ভাবনার আওতায় পড়ার যোগ্যতা রাখে না! পার্থিব জীবনকে সাজানোর জন্যই আমাদের এত শত পরিকল্পনা। কিন্তু আমাদের পরকালের পরিকল্পনা? পরকালের প্রস্তুতি?

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। পরকালের উত্তম প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার জন্য এখানে কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

১২.ঈমানকে বিশুদ্ধ রাখা

আল্লহ তা'য়ালা বলেন -

مَنۡ عَمِلَ صَالِحًا مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى وَ هُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَنُحۡيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجۡزِيَنَّهُمۡ اَجۡرَهُمۡ بِاَحۡسَنِ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ

'যদি কোনো পুরুষ বা নারী ভালো কাজ করে এবং সে ঈমানদার হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়াতে) পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখবো এবং (আখেরাতে) তাদের ভালো কাজের সর্বোত্তম পুরষ্কার দেব।' (সুরা সুরা নাহল: আয়াত ৯৭)

" শুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না।
যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।
তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবী জীবনে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসফলতা। " (সুরা ইউনুস; আয়াত ৬২-৬৪)

আল্লহ পাক আরো ইরশাদ করেন

وَمَن أَرادَ الآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعيَها وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعيُهُم مَشكورًا

আর যে আখিরাত চায় এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে মুমিন অবস্থায়, তাদের চেষ্টা হবে পুরস্কারযোগ্য।(সুরা বনি ইসরাইল; আয়াত ১৯)

মাগফিরাত তো বটেই সব আমলের জন্যই ঈমান বিশুদ্ধ করা আবশ্যক। ঈমান অশুদ্ধ হলে বা ঈমানে সমস্যা থাকলে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না। সাধারণভাবে ঈমান বলতে বোঝায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সবগুলোর ওপরে একত্রে ও সম্মিলিতভাবে ঈমান আনতে হবে। এটাকে ঈমানে মুজমাল বলা হয়।

'আমি ঈমান আনলাম সর্বসুন্দর নামধারী ও সর্ববিদ গুণের অধিকারী আল্লাহ তাআলার প্রতি এবং মেনে নিলাম তাঁর সকল আদেশ ও বিধানাবলি।'

এই সামগ্রিক মেনে নেয়ার ঘোষণার পরে বিস্তারিতভাবে যতটুকু সম্ভব হয় ঈমানের বিভিন্ন দিক জানা ও মান্য করা আবশ্যক। একইসঙ্গে ঈমানের কিছু দাবি আছে। অর্থাৎ আমরা যে ঘোষণা দিলাম তার প্রতিফলন আমাদের কাজে ও কর্মে ঘটাতে হবে।

ঈমানের প্রধান বিষয় হলো মহান আল্লাহ তায়ালার একাত্ববাদের ওপরে বিশ্বাস করা। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই এককভাবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সার্বভৌমত্ব এককভাবে তারই। তিনিই আইনদাতা, তিনিই পালনকর্তা, শাসনকর্তা এবং তিনিই সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী। মানুষ তার প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়াতে শাসন করে, প্রতিপালন করে এবং তাঁরই দেয়া সম্পদ সাময়িক ভোগ করে।

মহান আল্লাহ সম্পর্কে উপরিউক্ত বিবৃতির সঙ্গে কোনো মুসলমান দ্বিমত পোষণ করবেন না।

১৩.শরয়ী ইলম অর্জন

পরকালের প্রস্তুতিস্বরূপ একটি উত্তম পরিকল্পনা হলো, শরয়ী ইলম হাসিল করা। প্রত্যেক মুসলমানই দীনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে দৈনিক একটা সময় নির্ধারণ করবে। শরয়ী হুকুম-আহকাম, জায়েয-নাজায়েযের মাসয়ালা, তাওহীদ ও শিরকের মধ্যকার পার্থক্য, আনুগত্য ও অবাধ্যতা, সুন্নাত ও বেদআতের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে অবগত হবে। ফলে জানা যাবে আমলের ফযীলত ও উত্তম আখলাক সম্পর্কে। এভাবে এক সময় সে জান্নাতের পথ চিনতে পারবে। পূর্ণ মনোযোগের সহিত আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারবে। আখিরাতের চূড়ান্ত সফলতা লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়, এমন সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ

"যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে- সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। "(সুরা যুমার, আয়াত ০৯)

শায়খ সা'দী রহ. বলেন, এটা আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দা ও অবাধ্য বান্দা এবং আলেম ও জাহেলের তুলনামূলক অবস্থানের বর্ণনা। এই পার্থক্যটা সকলের মনসপটে স্পষ্ট। প্রত্যেকের মন-মস্তিষ্কই এ ব্যবধান সম্পর্কে অবগত। সুতরাং আল্লাহর ইবাদত হতে বিমুখ প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি আর উত্তম সময়ে (নির্ঘুম রাতে) উত্তম ইবাদত (কিয়ামুল লাইল) আদায়কারী অনুগত বান্দা সমান নয়।

অতঃপর আল্লাহ অনুগত বান্দার বর্ণনা দিয়েছেন, সে অধিক পরিমাণে উত্তম আমলগুলো আদায় করে। এরপর তার বর্ণনা দিয়েছেন, সে ভয়ও করে আবার আশা পোষণ করাও ত্যাগ করে না। আল্লাহ বলেন, তার এ ভয়ের সম্পর্ক পরকালের শাস্তির সাথে। পরকালের শাস্তির কথা স্মরণ করে সে তার পূর্বের কৃত গুনাহর জন্য ভয় করছে। অন্যদিকে, তার আশার সম্পর্ক আল্লাহর রহমতের সাথে। তার আশা আল্লাহ তো রহীম-রহমান। তিনি তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। মূলত, আল্লাহ এখানে তাঁর অনুগত বান্দার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বয়ান করেছেন।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُو

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে?" যারা তাদের রব সম্পর্কে জানে এবং জানে তাঁর দীন-শরীয়ত এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও তার রহস্য সম্পর্ক। এবং যারা উল্লিখিত বিষয়গুলো জানে না; তারা উভয় শ্রেণি সমান নয়। যেমনিভাবে রাত ও দিন সমান নয়, এক নয় আলো ও অন্ধকার। এবং যেমনিভাবে আগুন ও পানি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)- যারা জ্ঞানী, পবিত্র মেধার অধিকারী। তারা প্রতিটি বস্তুকে সস্থানে রাখে। তাই তারা বড়কে ছোটর ওপর প্রধান্য দেয়। ইলমকে প্রাধান্য দেয় জাহালাতের ওপর। তারা আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয় তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়ার ওপর। কারণ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে; ফলে তারা পরিণাম-দর্শনে সক্ষম হন। কিন্তু যাদের আকল নেই। যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রায় শূন্যের কোঠায়। তারা পরিণাম-দর্শন ও পর্যবেক্ষণে সক্ষম হয় না। ফলে তাদের অবস্থা হয় এর ঠিক বিপরীত। তারা কখনো পরিণামের দিকে দৃষ্টি দেয় না। তারা তাদের নফস ও মনের চাহিদাকে রব হিসেবে গ্রহণ করে।

মুআবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের বুঝ দান করেন।" (সহীহ বুখারী :৭১; সহীহ মুসলিম : ১০৩৭)

আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন। তালিবে ইলমের কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতাগণ তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান ও জমিনের সবকিছু এমনকি সাগরের মাছ পর্যন্ত আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সকল তারকার ওপরে চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমন। আলেমগণ নবী আলাইহিমুস সালাম-এর উত্তরাধিকারী। কিন্তু নবীগণ দীনার বা দেরহামের উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা ইলমের উত্তরাধিকার রেখে যান। সুতরাং যে তা গ্রহণ করল, সে পূর্ণ প্রাচুর্যই গ্রহণ করল।" (সুনানে আবু দাউদ :৩৬৪১; সুনানে তিরমিযি :২৬৮২)

শরয়ী ইলম অর্জনের সুফলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, এটি মানুষের মাঝে আল্লাহর আযাবের ভয় বৃদ্ধি করে। আখিরাতের বিষয়াদি সংরক্ষণের ব্যাপারে সতর্ক করে তোলে। কঠিন ভয়ংকর সেদিনের ব্যাপারে হাজারও হিসাব-নিকাশ করার মনোভাব তৈরি করে। ফলে তারা কোনো কথা বলা কিংবা কোনো কাজ করার আগে হাজারও হিসেব কষে নেয় যে, এতে কি তার প্রতিপালক সন্তুষ্ট হবেন না অসন্তুষ্ট হবেন?

(১) আল কুরআন অধ্যয়ন

পৃথিবীর সকল জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে আল কুরআন। আর এই ওহীর জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই।

কুরআন শব্দের মাঝেই এর পরিচয় রয়েছে। কেননা কুরআন শব্দটি 'কারউন' শব্দ মূল থেকে এসেছে। যার অর্থ বার বার পড়া, অধ্যয়ন করা। পৃথিবীর অন্য অনেক ধর্মগ্রন্থ যখন শুধুমাত্র বিশেষ কিছু ব্যক্তি বা সমাজের কিছু নির্দিষ্ট লোকদের ছাড়া অন্যদের জন্য পড়ার অনুমতি নেই। আর আল কুরআন সব শ্রেণীর, সব রকমের মানুষের জন্য নিজেকে শুধু উন্মুক্তই করে দিয়েছে তা নয় বরং সবাইকে এটি পাঠের জন্য উৎসাহিত করেছে, "এটি এমন কুরআন যা আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই, যেন লোকেরা খারাপ পরিণাম থেকে বাঁচতে পারে।" (সূরা যুমার: ২৮)

আল্লাহ আরো বলেন-

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিজের বান্দার ওপর এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন রকম বক্রতার অবকাশ রাখেননি। এটা সত্য, অকাট্য ও সরল দৃঢ় কথা বলার কিতাব। যেন সে লোকদেরকে আল্লাহর কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দেয় এবং ঈমান গ্রহণ করে যারা নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়, তাদের জন্য উত্তম কর্মফল রয়েছে।" (সূরা আল কাহাফ: ১-২)

"যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করেছে, অন্তরে গেঁথে নিয়েছে, অতঃপর কুরআন শরীফের হালালসমূহকে হালাল ও হারামসমূহকে হারাম জেনে আমল করেছে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে স্থান দেবেন এবং ঐ ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন থেকে দোযখের উপযুক্ত দশজন লোকের জন্য শাফায়াত করার তৌফিক দেবেন।" (তিরমিযী শরীফ-২৯০৫)

তাই রাসূল (সা.) এই বিষয়টিকে আরো গুরুত্ব দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন- "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যিনি কুরআন নিজে শিক্ষা করেছেন ও অন্যকে শিক্ষা দিয়েছেন।" (সহীহ আল বুখারী-৪৬৫৬/তিরমিযী-২৯০৭)

আবার আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করছেন- "আমরা এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণে কেউ প্রস্তুত আছে কি?" (সূরা কামার: ১৭)

আল্লাহ আরো বলেন, "এখন তোমরা উভয়েই এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। এখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে যদি কোন হেদায়াত পৌঁছায়, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াত অনুসরণ করে চলবে, সে বিভ্রান্তও হবে না আর দুর্ভাগ্যেও নিমজ্জিত হবে না। আর যে ব্যক্তি আমার "যিকর" (উপদেশ, নসিহত) থেকে বিমুখ হবে, তার জন্য দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ। আর কেয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে ওঠাবো। তখন সে বলবে- হে আল্লাহ! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম, এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ এমনিভাবেই তো আমার আয়াতগুলো যখন তোমার কাছে এসেছিল, তুমি তখন ভুলে গিয়েছিলে। ঠিক সে রকমই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।" (সূরা তোহা: ১২৩-১২৬)

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নবী! আপনি এ কুরআন তেলাওয়াত করুন, যা ওহীর সাহায্যে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে।" (সূরা আনকাবুত : ৪৫)

যারা কুরআন তেলাওয়াত করে কিন্তু এ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে না তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, "এরা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের গলার নীচে নামবে না। তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক থেকে ছিটকে পড়ে।" (বুখারী/মুসলিম/মুয়াত্তা/ তিরমিযী শরীফ-২১৯১)

রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা কুরআন পড়। হাশরের দিনও কুরআন নিজ সাথীদের জন্য সুপারিশ করবে।" (মুসলিম শরীফ-১৭৫১)

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তরে তালা লেগে

আছে?" (সূরা মুহাম্মদ: ২৪)

"তাদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক আছে, তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহর কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না। তারা শুধু কল্পনাই করে।" (সূরা বাকারা: ৭৮) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী (র.) বলেন, এখানে 'মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা' বলতে শুধুমাত্র তেলাওয়াত করাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ না বুঝে কেবল কুরআন তেলাওয়াত করা।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (র.) বলেন, "এখানে আল্লাহ তাঁর কিতাব বিকৃতকারী এবং ঐ সকল নিরক্ষরদেরকে মন্দ বলেছেন যারা শুধু তেলাওয়াত করে কিন্তু কুরআন বুঝার চেষ্টা করে না।"

" আপনার কাছে কুরআন নাযিল করেছি যেন আপনি লোকদের কাছে তাদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত কিতাবটি ব্যাখ্যা করেন। আর যাতে তারা নিজেরাও চিন্তা ভাবনা করতে পারে।" (সূরা নাহল: ৪৪)

এখানে ব্যাখ্যা বলতে শব্দ ও অর্থ দু'টোকেই বুঝানো হয়েছে।

আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "কুরআনের গভীর জনের অধিকারী ব্যক্তি যিনি প্রতি নিয়তই কুরআন পাঠ করে থাকেন, তিনি (আখেরাতে) নেককার সম্মানিত লিপিকর ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন আর যিনি কষ্ট করে কুরআন পাঠ করেন তিনি দ্বিগুন সওয়াব পাবেন।" (তিরমিযী শরীফ-২৯০৪/ মুসলিম শরীফ-১৭৩৯)

"নিশ্চয়ই এ কুরআন ঐ পথ দেখায়, যা একেবারে সোজা। যারা একে মেনে নিয়ে নেক আমল করতে থাকে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে এবং যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে জানিয়ে দেয়, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈরি করে রেখেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল ৯-১০)

আল্লাহ আরো বলেন, "আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে ঐসব লোককে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টি খুঁজে এবং তাঁর নিজের মর্জিতে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর তাদেরকে তিনি সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করেন।" (সূরা মায়েদা: ১৬)

"তবে কুরআন শুনিয়ে তাদের নসিহত ও সাবধান করতে থাকুন, যাতে কেউ নিজের আমলের কারণে ঐ (কঠিন) সময় গ্রেফতার না হয়, যখন আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী ও শাফায়াতকারী থাকবে না এবং যখন সে সব কিছু বিনিময় দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। কেননা এসব লোক নিজেদের আমলের জন্যই ধরা পড়ে

যাবে। তাদের কুফরির কারণে তাদের জন্য ফুটন্ত পানি ও বেদনাদায়ক আযাব রয়েছে।" (সূরা আন'আম ৭০)

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি, আল কুরআন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত পাওয়ার প্রধান উৎস।

তাই কুরআন নিজে পড়তে হবে এবং অন্যকে পড়তে সাহায্য করতে হবে। কুরআন থেকে তখনই হেদায়াত পাওয়া যাবে যখন আমরা এর আয়াতগুলোকে শুধু তোতা পাখির মতো অর্থ না জেনে তেলাওয়াত করা নয় বরং একে সহীহ করে পড়তে চেষ্টা করবো। এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানারও চেষ্টা করতে হবে।

(২) হাদীস অধ্যয়ন : রাসূল (সা.) এর কথা কাজ ও অনুমোদিত রীতি নীতিকে হাদীস বলে। রাসূল (সা.) প্রদর্শিত কুরআনের ব্যাখ্যাই হাদীস। এটি ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় নির্ভুল উৎস।

আল কুরআনে বলা হয়েছে- "তিনি (মুহাম্মদ সা.) নিজের ইচ্ছেমতো কোন কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন সবই আল্লাহর ওহী।" (সূরা আন নাজম: ৩-৪) রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, "আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এ দু'টিকে যে পর্যন্ত তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথহারা হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত।" (মিশকাত শরীফ- ২৪৩০/মুয়াত্তা)

তাই আল্লাহ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন, "রাসূল (সা.) তোমাদেরকে যা কিছুর নির্দেশ দিচ্ছেন তা গ্রহণ কর। আর যা কিছু থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল হাশর: ৭)

আমাদের মুসলিম সমাজে কুরআন অর্থ না বুঝে হলেও সওয়াবের আশায় অনেককেই তেলাওয়াত করতে দেখা যায়। কিন্তু হাদীস পড়ার অভ্যাস খুব কম মানুষেরই আছে। অনেক শিক্ষিত মানুষ তো কুরআন ও হাদীসেরই পার্থক্য করতে পারেন না। হাদীস অধ্যয়ন ছাড়া রাসূল (সা.) কি করে একটি জাহেলিয়াতের অমানিশায় ডুবে থাকা জাতিকে এক তাওহীদের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করেছেন, তাদেরকে নৈতিক চেতনাসম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর আদেশ নিষেধকে বাস্তবায়ন করার জন্য হাজারো তিরস্কার, যুলুম-নির্যাতন, বিরোধিতা, অপপ্রচারের কষ্ট কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছিলেন- এসব বিষয়গুলো জানা কিংবা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে আনন্দোজ্জ্বল (চিরসবুজ) রাখবেন যে আমার কাছ থেকে একটি হাদীস শুনলো, তা সংরক্ষণ করলো এবং তা অপরের কাছে পৌছে দিলো।" (তিরমিযী শরীফ-২৬৫৭)

"অনুসরণের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের সেই সব লোকদের জন্য রয়েছে উত্তম উদাহরণ যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ এবং শেষ দিনের (সফলতার) আশা পোষণ করে এবং বেশী বেশী আলোচনা করে আল্লাহকে।" (সূরা আহযাব: ২১) আমাদের করণীয়-

(১) আমাদেরকে প্রতিদিন ২/৩ টি হাদীস পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

(২) হাদীস জানার সাথে সাথে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে।

(৩) রাসূল (সা.) অনেক কষ্ট স্বীকার করে উম্মতের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন, বলে গেছেন। রাসূলের (সা.) সেই রেখে যাওয়া শিক্ষাকে কত হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সাহাবী, তাবেঈরা সংগ্রহ করেছেন আমাদের সুবিধার্থে। আমরা কতই না হতভাগ্য মুসলমান! রাসূলের সেই মূল্যবান কথাগুলো জানার বা মানারই চেষ্টা করলাম না। অথচ কাল কেয়ামতে রাসূলের শাফায়াতের আশা করি কত সহজেই।

(৩)ইসলামী সাহিত্য অধ্যায়ন

রাতের কিছু সময় জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত নফল ইবাদতের চাইতেও উত্তম।" (মিশকাত শরীফ-২৩৯) রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে তা তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে।" (তিরমিযী/মিশকাত শরীফ-২১০) আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, "হেদায়াত এবং জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। এর উদাহরণ এ রকম যেন মাটির উপর প্রচুর বৃষ্টি হলো। যে মাটি পরিষ্কার ও উর্বর তা ঐ পানি গ্রহণ করলো। ফলে অনেক ঘাস এবং শস্য উৎপন্ন হলো। আল্লাহ তা দিয়ে মানবজাতির কল্যাণ সাধন কমোস মানুষ তা পান করে এবং পশুদেরকে পান করায় এবং সেচ করে ফসল উৎপাদন করে। আর কিছু এমন অনুর্বর মাটি এমন আছে, যার উপর দিয়ে প্রচুর বৃষ্টি হলেও তা পানি ধরে রাখে না এবং ঘাসও উৎপাদন করে না। এটাই হল, এর উদাহরণ, যে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান আহরণ করে এবং তা থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে লাভবান হয়। আর অন্যদিকে কিছু লোক আছে এমন যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে না এমনকি তার দিকে মাথা তুলেও তাকায় না। ফলে তারা হেদায়াতও পায় না। আমাকে (রাসূল (সা.) কে আল্লাহ যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা আমি নিজে শিক্ষা করি এবং অন্যকে শিক্ষা দিই।" (বুখারী শরীফ-৭৯নং হাদীস) পূর্ববর্তী গুনাহের

ইউরোপে খ্রীস্টানদের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরীটি ছিল রাণী ইসাবেলার। যাতে বইয়ের সংখ্যা ছিলো মাত্র ২০১। ঠিক সে সময়ে ফাতেমীয় সম্রাজ্যের রাজধানী কায়রোতে মুসলমানদের পাঠাগারে জমা ছিলো ১০ লক্ষ বই। সেই জ্ঞান অর্জনের পথ থেকে দূরে সরে আজকে মুসলমান জাতির এই অধঃপতন নেমে এসেছে।

তাই মুসলমানদেরকে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, চিন্তাবিদ গবেষক, মুজতাহিদের লিখিত বইগুলো পড়ার অভ্যাস করতে হবে। এটি আমাদের ইসলামকে আরো সহজভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

আমাদের করণীয় হল, প্রতিদিন ১০/২০ পৃষ্ঠা ইসলামী সাহিত্য পড়ার অভ্যাস আমাদের তৈরি করতে হবে।ইসলাম সম্পর্কে নিজের এবং অন্যের জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়া আমাদের জন্য সহজ হবে এই বই পড়ার মাধ্যমে।

১৪.নেক আমলের ফজিলত সম্পর্কে জানা ও আমল করা

আখিরাতের পরিকল্পনার অন্যতম একটি অংশ হলো, তারগীব ও তারহীব-নেয়ামতের আশা ও শাস্তির ভীতি জাগানিয়া কিতাবগুলো পড়া। বিভিন্ন আমলের ফযীলতসংক্রান্ত কিতাবগুলো বেশি বেশি অধ্যয়ন করা। কারণ এ সকল কিতাব আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী, নেক আমলের ওপর স্থির থাকার ক্ষেত্রে সহায়ক।

উদাহরণত যখন যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে পড়া হবে, যখন পড়া হবে যে আল্লাহ তাআলা যিকিরকারীর জন্য আখিরাতে এই এই নেয়ামত রেখেছেন। তখন নিজের মধ্যে অধিক যিকির করার উৎসাহ সৃষ্টি হবে এবং নিয়মিত যিকিরের আমল অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

এরকমভাবে প্রতিটি আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে একই কথা। যেমন কিয়ামুল লাইল, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, চাশত ও বিতর-এর নামাজ, নফল রোজা, দান-সদাকা, সালামের প্রসার ঘটানো, মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা, মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো, প্রতিবেশীর হক আদায় করা, ইয়াতীমের তত্ত্বাবধান করাসহ ইত্যাদি ইবাদত। যখন প্রতিটি আমলের ফযীলত সম্পর্কে জানা থাকবে, তখন সেই আমল করার প্রতি অন্তর উদ্বুদ্ধ হবে। নিয়মিত সেই আমল করতে মন চাইবে। মন সব সময় উৎসুক থাকবে, মনের মাঝে তড়প থাকবে- কখন আসবে সে আমলের নির্ধারিত সময়।

* নেক আমলে প্রতিযোগিতা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

"তোমরা কল্যাণের কাজের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর।" (সুরা বাকারা:১৪৮)

শায়খ সা'দী রহ. বলেন-

"কল্যাণকর কাজের আদেশ প্রদানের পর প্রতিযোগিতার আদেশটি নতুন একটি আদেশ। কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা থাকা কাজটি বাস্তবায়িত হওয়া, পূর্ণতার সাথে অস্তিত্বে আসা এবং সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত করে। প্রতিযোগিতা থাকলে কাজ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি পার্থিব কল্যাণকর কাজের ক্ষেত্রে অগ্রসর থাকবে, সে আখিরাতের

কাজেও জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীদের মাঝে থাকবে। তাই প্রতিযোগীরা মর্যাদা-বিচারে সর্বোত্তম হয়ে থাকে। কল্যাণকর কাজ দ্বারা ফরয, নফল উভয়টাই উদ্দেশ্য। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, জিহাদসহ স্বল্প ও ব্যাপক উপকার প্রদায়ক সকল আমলই প্রতিযোগিতা করা যায় এমন কল্যাণকর কাজের অন্তর্ভুক্ত।"

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

"অন্ধকার রাতের মতো ফেতনা গ্রাস করার আগেই তোমরা আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে ভয়ংকর ফেতনাকালে মানুষ সকালে মুমিন থাকবে আর বিকেলে কাফের হয়ে যাবে। আবার বিকেলে মুমিন থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে। মানুষ সামান্য দুনিয়ার বিনিময়ে তার দীন বিক্রি করে দেবে।" (সহীহ মুসলিম :১১৮)

*কীভাবে আমরা জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবো?

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ: فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

"উহুদের দিন এক সাহাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যদি এখন নিহত হই, তাহলে আমি কোথায় থাকব বলে আপনি মনে করেন?' তিনি বললেন, 'জান্নাতে।' অতঃপর তিনি হাতে থাকা খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে লড়াই শুরু করলেন এবং এক পর্যায়ে শাহাদাত বরণ করেন।" (সহীহ বুখারী:৪০৪৬;সহীহ মুসলিম:১৮৯৯)

হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, নেক আমলের ক্ষেত্রে দেরি করা মোটেও উচিত নয়। বরং যখনই কোনো নেক আমল করার সুযোগ আসবে, সাথে সাথে তা করে ফেলতে হবে।

* উৎসাহ প্রদায়ক কয়েকটি কিতাব

পরকালের প্রস্তুতিস্বরূপ আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি, আমলের ওপর অটল থাকার জন্য নিম্নে উল্লিখিত কিতাবগুলো পড়ার পরামর্শ থাকবে-

... رياض الصالحين (রিয়াযুস সালেহীন) ইমাম নববী রহ.

খ. الأذكار। (আল আযকার)- ইমাম নববী রহ.

যথার্থ ও উত্তমরূপে পরকালের প্রস্তুতি নিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমলের ফযীলত সম্পর্কে জানতে হবে। সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত (এ দুটি) কিতাব অবশ্য পাঠ্য

আমাদের উচিত সাপ্তাহিক অথবা মাসিক একটা দিন নির্ধারণ করা , যখন আমলের ফযীলতসংক্রান্ত বিসিক পড়ব। যাতে করে সব সময় আমাদের স্মরণে আমলের ফযীলতগুলো উপস্থিত থাকে। ফলে সর্বদা আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে বেশি বেশি নেক আমল করতে পারব।

* **কতিপয় বিরাট ফযীলতপূর্ণ আমলের বর্ণনা**

পরকালের প্রস্তুতির ভিন্ন ধরনের একটি পরিকল্পনা হলো, সে সকল আমলের প্রতি আগ্রহী হওয়া, যেগুলোতে রয়েছে একাধিক ফযীলত।

প্রথম উদাহরণ:

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

যিকিরের ক্ষেত্রে অনেক ফযীলত ও মহাপ্রতিদানের কথা বর্ণিত হয়েছে।যেমন-

প্রথম ফযীলত: এটি আল্লাহ তাআলার অত্যন্ত প্রিয় বাক্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ،

"আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় কালিমা হচ্ছে চারটি-
سُبحان اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ
"এদ্বারা শুরু কর, এতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। " (সহীহ মুসলিম:২১৩৭)

দ্বিতীয় ফযীলত: এ দুআ পাঠকারী সদাকার সাওয়াব পাবে। আবু যার রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ،
وكل تحميدةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَفِيٌّ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ تَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"তোমাদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপরই সদাকা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তোমার প্রত্যেকবার তাসবীহ পড়া সদাকা, তোমার প্রতিবার তাহমীদ বা আল্লাহর প্রশংসা করা সদাকা, প্রতিটি তাহলীল বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া সদাকা, তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বলা সদাকা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা সদাকা। আর এসব কিছুর জন্য যথেষ্ট হবে দুই রাকাত সালাতুত দুহা আদায় করা।" (সহীহ মুসলিম:৭২০)

তৃতীয় ফযীলত: এ যিকির আদায়ে জান্নাতে গাছ রোপণ করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"ইবরাহীম আ.-এর সাথে মেরাজের রাতে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন- হে মুহাম্মাদ, আমার পক্ষ থেকে আপনার উম্মতের নিকট সালাম জানাবেন। তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, জান্নাত উত্তম মাটির আবাস, মিষ্ট পানির আধার। তবে তা সমতল ভূমি; তাতে গাছ
سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَر
(সুনানে তিরমিযি :৩৪৬২, তিরমিযি রহ. বলেন এ হাদিসটি হাসান)

চতুর্থ ফযীলত: এটা কিয়ামতের দিন নেকির পাল্লাকে পূর্ণ করে দেবে। আবু মালেক আল আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

الطهورُ شَطْرُ الإيمانِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। আলহামদুলিল্লাহ নেকির পাল্লাকে ভরে দেয়। 'সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুল্লিহ' আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী জায়গা পূর্ণ করে দেয়। " (সহীহ মুসলিম:২২৩)

পঞ্চম ফযীলত: এটা সর্বোত্তম যিকির। জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি-

أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

"সর্বোত্তম যিকির হলো لا إله إِلَّا الله বলা। (সুনানে তিরমিযি; তিরমিযি রহ. এ হাদিস কে হাসান বলেছেন)

দ্বিতীয় উদাহরণ: জামাতের পাবন্দি করা

একটি আমল করে অনেক নেকি অর্জনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উদাহরণটি হলো, জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা। জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার ফযীলত অনেক। তন্মধ্যে:

প্রথম ফযীলত: জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার মাঝে রয়েছে একাকী নামাজ আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ، أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"একাকী নামাজ আদায় করার চাইতে জামাতে নামাজ আদায় করার মাঝে রয়েছে সাতাশগুণ বেশি সাওয়াব। "(সহীহ মুসলিম : ৬৫০)

দ্বিতীয় ফযীলত: ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর জিম্মায় (দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানে) থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ

فِي نَارِ جَهَنَّمَ

"যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করবে, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে। কেউ যেন আল্লাহর জিম্মায় হস্তক্ষেপ না করে। কেননা, যে-ই তাঁর জিম্মায় হস্তক্ষেপ করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। "(সহীহ মুসলিম:৬৫৭)

তৃতীয় ফযীলতঃ প্রথম কাতারে নামাজ পড়া এবং জামাতের ডান দিকে নামাজ পড়ার অনেক ফযীলত রয়েছে। এতদুভয়ের একত্রিকরণে সাওয়াব হয়ে পড়ে দ্বিগুণ। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ الاسْتَهمُوا....

"আযান দেওয়া ও প্রথম কাতারে নামাজ আদায়ের ফযীলত যদি মানুষ জানত, এমনকি সে সুযোগ যদি লটারি ব্যতীত পাওয়া দুষ্কর হতো; তবে তারা এর জন্য অবশ্যই লটারি করত।" (সহীহ বুখারী: ৬১৫; সহীহ মুসলিম: ৪৩৭)

• **তৃতীয় উদাহরণ:** পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া

• **প্রথম ফযীলত:** মসজিদে এসে জামাতে নামাজ আদায় করার প্রতি আগ্রহী মুমিন কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। আবু হুরাইরা রাযি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ

"যেদিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন তিনি সাত প্রকার মানুষকে তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয়। দান করবেন। (১.) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২.) ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মাঝে বেড়ে উঠেছে। (৩.) ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে লেগে থাকে।... "(সহীহ বুখারী :৬৬০; সহিহ মুসলিম: ১০৩১)
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعلَّق فِي الْمَسَاجِد
এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন- "অর্থাৎ মসজিদের সাথে তার থাকবে গভীর ভালোবাসা, সর্বদা সে জামাতের পাবন্দি করবে। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ কথার অর্থ এ নয় যে, সর্বদা মসজিদেই থাকতে হবে।"

দ্বিতীয় ফযীলত: মুমিনের মর্যাদার স্তর উন্নীত হওয়া, গুনাহ মাফ হওয়া ও সাওয়াব অর্জনের অন্যতম আমল হলো, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا
دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً ....

"কোনো ব্যক্তি যদি উত্তমরূপে ওযু করে কোনো একটি মসজিদ পানে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি কদমের জন্য একটি করে সাওয়াব দান করেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে
গুনাহ মোচন করেন।"(সহিহ মুসলিম :৬৫৪)

তৃতীয় ফযীলত: ওযু করে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার জন্য বের হলে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত নফল নামাজের সাওয়াব হতে থাকে। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ

"যখন তোমাদের কেউ বাড়ি থেকে ওযু করে মসজিদে আসে; বাড়িতে ফেরা পর্যন্ত সে নামাজের মধ্যে আছে বলে গণ্য হবে।" (সহীহ ইবনে খুযাইমা: ৪৩০)

চতুর্থ ফযীলত: যে মুমিন অন্ধকারের মাঝে হেঁটে নামাজের জন্য মসজিদে যাবে, কিয়ামতের দিন তার পূর্ণ নূর হবে। বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"অন্ধকারে পায়ে হেঁটে মসজিদে গমনকারীদের কিয়ামতের দিনের পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও। (সুনানে তিরমিজি: ২২৩)

১৫.কল্যাণের কতিপয় পথ নির্দেশ:

ইমাম নববী রহ. রিয়াযুস সালেহীন নামক কিতাবে 'কল্যাণের পথসমূহ' নামে একটি অধ্যায় এনেছেন, এতে তিনি উল্লেখ করেছেন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। (সুরা যিলযাল, আয়াত ৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

"যে কোনো কল্যাণের কাজ করল, সে তা নিজের জন্যই করল।" (সূরা ফুসসিলাত,আয়াত ৪৬)

ইমাম নববী রহ. এই অধ্যায়ে কিছু হাদীস এনেছেন, যা অধিক কল্যাণ অর্জন করার পথ নির্দেশ করে।

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ

"পুণ্যের কোনো কাজকেই তুমি তুচ্ছ মনে কোরো না। যদিও সেটা তোমার মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মিলিত হওয়ার মতো আমলই হোক না কেন। " (সহীহ মুসলিম ২৬২৬)

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ

"আমি এক লোককে দেখলাম, জান্নাতে ঘোরাঘুরি করছে। তার জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে, রাস্তার ওপর থেকে সে একটি গাছ কেটে সরিয়ে রেখেছিল, যেই গাছের কারণে মুসলমানদের রাস্তায় চলাচলে কষ্ট হতো। " (সহিহ মুসলিম :১৯১৪)

গ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

"প্রত্যেক সৎকাজই সদাকা।" (সহিহ বুখারী :৬০২১; সহীহ মুসলিম ১০০৫)

ঘ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ ঐ বান্দাকে পছন্দ করেন, যে খাবার খেয়ে বা পানীয় পান করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করে। " (সহিহ মুসলিম :২৭৩৪)

* আবু বকর রাযি. সকল কল্যাণের কাজ একত্রিত করেছেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ
الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اجْتَمَعْنَ فِي أَمْرِي. دَخَلَ الْجَنَّةَ

"একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে রোজা রেখেছ? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযায় শামিল হয়েছ? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ মিসকীনকে খাবার খাইয়েছ? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ রোগীর শুশ্রূষা করেছ? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার মধ্যে এ সকল বিষয় একত্রিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"
(সহিহ মুসলিম:১০২৯)

আল্লাহর পথের পথিক, আল্লাহর সন্তুষ্টি- প্রত্যাশী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সকল পথই অবলম্বন করবে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সকল ক্ষেত্রেই থাকবে তার বিচরণ। সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সকল ইবাদত করবে। আনুগত্য তাকে যেখানেই নিয়ে যাক, সেদিকে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। আনুগত্য-আদেশের কারণে তাকে যেখানে যেতে হয়, সে সেখানে যাবে। যেখানে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, সেখানেই আপাম তার পদচারণা লক্ষ করবেন। যদি ইবাদত ইলমের ক্ষেত্রে হতে হয়। তাকে আলেম ও তালেবে ইলমদের সাথে পাওয়া যাবে। যদি আল্লাহর আনুগত্য তাকে জিহাদের আদেশ দেয়, তবে তাকে মুজাহিদদের কাতারে জিহাদের ময়দানে পাওয়া যাবে। নামাজের সময় তাকে পাবো নামাজরত বান্দাদের সাথে। যিকিরের সময় তাকে পাবো যাকেরীনদের সাথে। সদাচরণের সময় তাকে সদাচরণকারীদের সাথে পাবো। আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর ধ্যান, স্বীয় সমালোচনার সময় তাকে পাবো আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশকারীদের সাথে। যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কোন ইবাদতটি করতে চাও? সে বলবে, আমি আমার রবের সকল আদেশ পালন করতে চাই। আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর আদেশগুলো পালন করতে চাই। চাই তা যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক। এ আনুগত্য ও ইবাদত আমাকে যেখানেই নিয়ে যাক। আমি শুধু ইবাদত করতে চাই। আমার একমাত্র আগ্রহ, আমি রবের ইবাদত করব, তাঁর আদেশকে কার্যে পরিণত করব। এবং তা প্রতিষ্ঠিত করব। আমার প্রাণ, আমার আত্মা, আমার হৃদয়, আমার শরীর, আমার সুখ-দুঃখ- সবই তাঁর জন্য সমর্পিত। আমি তো তাঁর নিকট মূল্য অর্পণ করেছি, এবার তাঁর কাছ থেকে বিনিয়ম পাবার অপেক্ষা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।" (সুরা তাওবা; আয়াত ১১১)

তিনি জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। যে এটা বুঝেছে এবং কার্যে পরিণত করেছে, সেই-ই প্রকৃত সালেক। এবং

সেই-ই আল্লাহ তাআলার ইবাদতের অর্থ বুঝেছে। সর্বদা তার মন রসের সাথে লেগে থাকে, তার চোখ খুঁজতে থাকে রবের অনুগত হওয়ার পথ ও পদ্ধতি। তার মনে আল্লাহর ভালোবাসা ব্যতীত ভিন্ন কোনো বস্তু, জিঙ্গা কিছুর তলব থাকে না। তার চাওয়া থাকে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা একজন বান্দা যখন এ পথে চলে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন, তাকে নিকট করে নেন, নির্বাচিত করেন, তার অন্তরকে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করান, তার জীবনের ও দীনের সকল কাজই একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তাকে তিনি উত্তম চরিত্র দান করেন। তাকে জানিয়ে দেন পিতা তার আদরের পুত্রকে কীভাবে গড়ে তুলবে।

১৬.কিছুটা সময় রবের স্মরণে একান্ত আলাপনে কাটানো:

একজন মুসলিম সারাটা দিনই মানুষের ভিড়ে হারিয়ে থাকবে, মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনায় সময় কাটিয়ে দেবে- এমনটা একেবারেই অনুচিত। এমন যদি অবস্থা হয়, তবে কখন সে মানুষটি নিজেকে সময় দেবে? কখন সে নিজের সংশোধনে, আত্মা পবিত্রকরণে সময় ব্যয় করবে? তাই পরকালের প্রস্তুতি-পরিকল্পনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে- দৈনিক কিছু সময় একাকী নির্জনে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। রবের স্মরণে একান্ত আলাপনে সময় কাটানো। রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আমাদের মানুষের ভিড় থেকে নিজেকে মুক্ত করে একাকী নির্জনে প্রভুর সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য একটা সময় নির্ধারণ করতে হবে এ সময়টা কেবল প্রভুর ও আমাদের হবে। অন্য কারও তাতে হস্তেক্ষেপের অধিকার থাকবে না। দৈনিক অন্তত দিনে একটি ঘণ্টা এবং রাতে একটি ঘণ্টা নির্ধারণ করা উচিত। একজন মুসলিম যখন দীনি-দুনিয়াবি কোনো উপকার ব্যতীতই অন্যের সাথে যত বেশি মেলামেশা করতে থাকে, তখন তার পরকালের প্রস্তুতি তত দুর্বল হতে থাকে।

প্রতিটি মুসলমানের উচিত তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গনীমত মনে করা, ইবাদতে কাজে লাগানো, আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য ব্যয় করা। জীবনের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময়ও একজন মুসলিমের জন্য অমূল্য রতনস্বরূপ। তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসই মূল্যবান। কোনো মূল্যেই একটি মুহূর্ত ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা অনেকেই সময়কে খুব সস্তা মনে করি। একজন অপরজনকে গল্প-গুজবে আহ্বান করার মানেই হলো, تعال نقتل الوقت "এসো, আমরা জীবনকে নষ্ট করি।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى - يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

"সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? সে বলবে- হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম।" (সূরা ফাজর: ২৩ _ ২৪)
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

ইমাম তাবারী রহ. বলেন

- এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানকে জানিয়ে দিচ্ছেন- দুনিয়াতে অযথা সময় নষ্ট করা, নেক আমলে কমতি করার কারণে কিয়ামতের দিন তারা লজ্জিত হয়ে আফসোস করতে

থাকবে। কারণ, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনটা আখিরাতের অনন্ত সময়ের নেয়ামত প্রাপ্তির মাধ্যম। যে আখিরাতের কোনো শেষ নেই। সেদিন সে আফসোস করে করে বলবে, হায়, দুনিয়াতে অযথা সময় নষ্ট না করে যদি নেক আমল করতাম! যদি এই চিরস্থায়ী জীবনের জন্য কিছু পাথেয় পাঠাতাম! যদি জীবনটা আনুগত্য-ইবাদতে কাটাতাম; তবে আজ আল্লাহর ক্রোধ হতে তা আমায় বাঁচাত, তাঁর অসন্তুষ্টি আমার জন্য অবধারিত হতো না। হায়, আমি এ কী করলাম। এখানে তো মৃত্যুও নেই যে, মরে বেঁচে যাব

১৭.ঈমানি পরিবেশে থাকা

ঈমানি পরিবেশ মুসলমানকে তার পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা করে। তাই পরকালের কল্যাণ অর্জনে উত্তম ও নেককার লোকদের সঙ্গী হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে, যাদের সাক্ষাৎ আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেবে ও তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে।

খারাপ ও বদকার লোকদের সাথে থাকা গুনাহের নিকটবর্তী করবে ও আল্লাহর ইবাদত ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। অন্তর, মন-মস্তিষ্ক, এমনকি দেহকেও আল্লাহর নাফরমানি ও দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে দেবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ

أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

"আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে, তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার অন্তরকে আমার থেকে থেকে গাফেল করে দিয়েছি- যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না। " (সূরা কাহাফ: ২৮)

শায়খ সা'দী রহ. বলেন, "এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীদের আদেশ করেছেন, তারা যেন সর্বাবস্থায় মুমিন এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ কোরা বান্দাদের সাথে থাকে।

(-الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ)
তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাই তাদেরকে এখানে ইবাদত ও ইখলাসের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যবান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তম লোকদের সঙ্গ গ্রহণ করতে, প্রবৃত্তির বিপরীতে গিয়ে তাদের সাথে থাকতে আদেশ করা হয়েছে। যদি তারা দরিদ্রও হয়, তবুও তাদের সান্নিধ্যে থাকার কথা বলা হয়েছে। কেননা, তাদের সুহবতে অনেক উপকারিতা। যা গণনা করা সম্ভব নয়।

وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ

পার্থিব কোনো কারণে সালেহীন ও নেককারদের সুহবত ত্যাগ করবে না। তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে না।

تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

কারণ এতে কেবল ক্ষতিই রয়েছে। এ কারণে আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এবং এটা অন্তরকে দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করিয়ে দেবে। ফলে তার চিন্তা-চেতনা সবকিছুই হয়ে যাবে দুনিয়া কেন্দ্রিক। অন্তর থেকে উঠে যাবে পরকালের আগ্রহ-উদ্দীপনা। কেননা, দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতিই তার দৃষ্টি আটকে থাকবে এবং এর প্রতিই অন্তর আকৃষ্ট হবে। ফলে আল্লাহর যিকির থেকে অন্তর গাফেল হয়ে যাবে। সে আল্লাহর যিকিরের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুনিয়ার তুচ্ছ ও নোংরা কামনা-বাসনার প্রতি তার মন আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। সময় নষ্ট করতে থাকবে অযথা হারাম কাজে। ফলে সে হবে চিরস্থায়ী লজ্জার পাত্র ও চির ক্ষতিগ্রস্ত। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন ("আপনি তার অনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি-যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।") যে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকে, আল্লাহ তাআলাও তাঁর স্মরণ থেকে তাকে গাফেল করে রেখে তাকে শাস্তিতে নিপতিত করে। অর্থাৎ তার মন যখন যা চায় তাই করে। মনের চাহিদা মেটানোর জন্য সে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। যদিও সে জানে, এতে তার ক্ষতি ও ধ্বংস অনিবার্য। তবুও সে তার মনের চাহিদা মেটানোর পেছনেই ছুটে চলে। যেন সে তার মনের প্রবঞ্চনাকেই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে-শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?"(সূরা জাসিয়া: ২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

"মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ করে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।"(সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৩৩)

অর্থাৎ বন্ধুত্ব করার পূর্বে প্রত্যেকে যেন পর্যবেক্ষণ করে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাচ্ছে। সে যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চাচ্ছে, সে কি তার ধর্ম-বিশ্বাস ও তার আমল-আখলাকের ওপর সন্তুষ্ট? সে কি তা পছন্দ করে? যদি করে তবেই তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। অন্যথায় তাকে পরিত্যাগ করবে।

বন্ধুই পারে একজন মানুষের বাস্তব অবস্থা, তার চরিত্র-চালচলন, এমনকি তার পুরো জীবনটাই পরিবর্তন করে দিতে। নেক বন্ধু যেমন একজন মানুষের জীবনকে পবিত্রতার ঘ্রাণে সুবাসিত করতে পারে, তেমনি একজন খারাপ বন্ধু জীবনকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। প্রবাদে আছে: الصاحب ساحب। "বন্ধু-ই বন্ধুকে টেনে নিয়ে যায়।" ভালো হলে ভালো পথে, আর খারাপ হলে খারাপ পথে।"

১৮.দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক কমানো

আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির আরেকটা মাধ্যম হচ্ছে, যথাসম্ভব দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক, দুনিয়াবি ব্যস্ততা এবং পার্থিব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির কমিয়ে দেওয়া। যেন দুনিয়া ভাবনার প্রধান কারণ এবং জ্ঞানের একমাত্র দিক না হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

"তারা পার্থিব জীবন সম্পর্কে বেশ অবগত; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে বেখবর। " (সূরা রুম : ০৬)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহ. বলেন- "অধিকাংশ মানুষত কেবল দুনিয়া সম্পর্কে বেশ অবহিত। কীভাবে দুনিয়া কামাবে, দুনিয়ায় কোন্ত করবে-এর প্রতিটা পথ ও প্রতিটা অলিগলি সম্পর্কে সে সদা সজাগ ও সদা অবগত থাকে। কিন্তু পরকাল সম্পর্কে থাকে একেবারেই গাফেল, পূর্ণ বেখবর। আখিরাতের জন্য কী উপকারী আর কী অপকারী, সে সম্বন্ধে তারা বড়ই অজ্ঞ। যেন অনুভূতিহীন মানুষ: যার কোনো কিছুর চিন্তা নেই।"

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন- তারা হলো কাফের। এদের চিন্তা-চেতনার পুরোটাই দুনিয়ার বসতি নিয়ে। দীনের বিষয়ে তারা জাহেল থাকে।
শায়খ সা'দী রহ. বলেন, সকল দিক থেকেই দুনিয়ার চেয়ে আখিরাত উত্তম। আখিরাত চিরস্থায়ী এবং এর নেয়ামতরাজিও চিরস্থায়ী। আর দুনিয়া অস্থায়ী এবং তার সবকিছুই অস্থায়ী ও ক্ষণিকের। বুদ্ধিমান মুমিন কখনো খারাপকে ভালোর ওপর প্রাধান্য দিতে পারে না। চিরসুখের পরিবর্তে ক্ষণিকের আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দিতে পারে না। আখিরাতের ওপর দুনিয়ার ভালোবাসা এবং দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়াই হচ্ছে সকল অপরাধের মূল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।" (সুরা হিজর:৮৮)

শায়খ সা'দী রহ. বলেন, দুনিয়ার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তা ধরার জন্য তোমার হাত প্রসারিত করো না। দনিয়ার বিভিন্ন জিনিস যেমন মজাদার খাবার- পানীয়, সুন্দর সুন্দর পোশাক, জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি, রূপসী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তুমি তাদের দিকে বারবার দৃষ্টি ফিরিও না। কারণ, এসব কিছুই হচ্ছে দুনিয়ার চাকচিক্য; যা নিয়ে প্রতারিত লোকদের অন্তর উল্লাস করে। যার প্রতি মুগ্ধ হয়ে আখিরাতকে অবজ্ঞা করে জালিম ও অবাধ্যরা। এরপর খুব দ্রুতই এই চাকচিক্য চলে যায় এবং তার সবকিছু শেষ হয়ে যায়। তার প্রতি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট লোকদের সর্বশ্রান্ত করে দেয়, ছিনিয়ে নিয়ে যায় সবকিছু। এরপর তারা লজ্জিত হবে, যখন লজ্জা কোনো কাজে আসবে না। কিয়ামতের দিন তারা জানতে পারবে যে, কী নিয়ে তারা আনন্দ উল্লাস করেছে এবং কীসের পেছনে তারা ছুটেছে। অথচ আল্লাহ এগুলোকে বানিয়েছেন ফেতনা ও পরীক্ষার বস্তু হিসেবে। যাতে করে তিনি জানতে পারেন, কে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রতারিত হয় এবং কে উত্তম আমল করে সফল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا - وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

"আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে। এবং তার ওপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেবো। " (সূরা কাহাফ ৭-৮)

ইবনে উমার রাযি. বলতেন-

إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحْتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

"তুমি যখন বিকেলে উপনীত হও, তখন সকালের আশা করো না। যখন সকালে উপনীত হও, তখন বিকেলের অপেক্ষা করো
না। বরং তুমি তোমার সুস্থ অবস্থায় অসুস্থতার জন্য পাথেয় সংগ্রহ কর। জীবন থাকতে থাকতে পাথেয় সংগ্রহ কর মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য। " সহীহ বুখারী :৬৪১৬)

মানুষ যত বেশি দুনিয়ার ব্যস্ততা পরিহার করবে, আখিরাতের জন্য তার প্রস্তুতি তত বাড়তে থাকবে।

১৯.আত্মসমালোচনা : গুরুত্ব ও পদ্ধতি

মানবজাতিকে আল্লাহ তা‘আলা আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে স্বাধীন চিন্তাশক্তি দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। ফলে তার মাঝে তিনপ্রকার নফসের সম্মিলন ঘটেছে। নাফসে আম্মারাহ, নফসে লাউওয়ামাহ এবং নাফসে মুতমাইন্নাহ। এর মধ্যে নফসে আম্মারাহ বা কুপ্রবৃত্তি মানুষকে জৈবিক কামনা-বাসনা ও দুনিয়ার লোভ-লালসার দিকে আকৃষ্ট করে তাকে মন্দ কাজের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي ‘নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ। কিন্তু সে মন নয়, আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন’ *(ইউসুফ ১২/৫৩)।* অধিক হারে মন্দকাজ বান্দার অন্তরকে কঠিন করে তোলে ও ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন বান্দা কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়। যখন সে তওবা করে তখন সেটা তুলে নেওয়া হয়। আর ইস্তেগফারের মাধ্যমে অন্তরকে পরিষ্কার করা হয়। আর যদি পাপ বাড়তেই থাকে তাহ’লে দাগও বাড়তে থাকে। আর এটাই হ’ল মরিচা।[তিরমিযী হা/৩৩৩৪; মিশকাত হা/২৩৪২।]

যেমন আল্লাহ বলেন, ‘বরং তাদের কৃতকর্মের ফলেই মনের উপর মরিচা জমে গেছে’ *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৪)।* দুনিয়াতে প্রতিটি মানবসত্তাই মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাই তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আত্মসমালোচনা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিদিন মানুষ নিজেই নিজের পাপের হিসাব নেওয়ার মাধ্যমে পুনরায় ঐ পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। এছাড়া ব্যক্তির মাঝে যে পাপবোধ সৃষ্টি হয় আত্মসমালোচনা তাকে ক্ষমা লাভের উপযুক্ত করে তোলে।

আত্মসমালোচনার পরিচয় :

আভিধানিক অর্থে আত্মসমালোচনা হল নিজের সম্পর্কে সমালোচনা করা। একে আরবীতে বলা হয়, محاسبة النفس অর্থাৎ স্বীয় আত্মার হিসাব গ্রহণ করা। লিসানুল আরব অভিধানে বলা হয়েছে, ‘মুহাসাবা’র শাব্দিক অর্থ হ’ল গণনা করা বা হিসাব করা। সুতরাং ‘মুহাসাবাতুন নাফস’-এর অর্থ হচ্ছে আত্মার হিসাব গ্রহণ করা। ইংরেজীতে একে বলা হয়, self-criticism বা self-accountability অর্থাৎ আত্মসমালোচনা।

পারিভাষিক অর্থে আত্মসমালোচনা বলতে বুঝায়, সচেতনভাবে কোন কাজ সম্পন্ন করা বা পরিত্যাগ করা, যাতে কৃতকর্ম সম্পর্কে নিজের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে। সুতরাং যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজ হয়, তবে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করা। আর যদি তা আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজ হয় তবে তা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকা। সাথে সাথে নিজেকে সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজ তথা ইবাদতে মশগূল রাখা।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আত্মসমালোচনার অর্থ হচ্ছে- নিজের করণীয় এবং বর্জনীয় পৃথক করে ফেলা। অতঃপর সর্বদা ফরয ও নফল কতর্ব্যসমূহ আদায়ের জন্য প্রস্তুত

থাকা এবং হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করার উপর সুদৃঢ় থাকা। তিনি আরো বলেন, আত্মসমালোচনার অর্থ হ'ল প্রতিটি কাজে সর্বপ্রথম আল্লাহর হক্ব সমূহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া; অতঃপর সে হক্বগুলো যথাযথভাবে আদায় করা হচ্ছে কি-না সেদিকে লক্ষ্য রাখা *(আল-ফাওয়ায়েদ)*।

আত্মসমালোচনার হুকুম ও গুরুত্ব :

'মুহাসাবাতুন নাফস' বা আত্মসমালোচনাকে প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ، وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিত আগামী কালের জন্য (অর্থাৎ আখিরাতের জন্য) সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক' *(হাশর ১৮)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রাববুল আলামীন প্রত্যেক মুমিনের জন্য আত্মসমালোচনাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলছেন, তোমাদের অবশ্যই চিন্তা করা কর্তব্য যে, আগামী দিনের জন্য তুমি যা প্রেরণ করেছ তা তোমার জান্নাতের পথ সুগম করছে, না-কি তোমাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? [ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কিতাব আল- আরাবিইয়াহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৬), ১/১৮৭ পৃঃ।]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আত্মসমালোচনাকারীদের প্রসংশা করে বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ- 'যাদের মনে আল্লাহর ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে' *(আ'রাফ ৭/২০১)*।

আত্মসমালোচনার গুরুত্ব সম্পর্কে ওমর (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا، وَزِنُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا.

فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِيْ الْحِسَابِ غَدًا، أَنْ تُحَاسَبُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ، وَتَزَيَّنُوْا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

'তোমরা নিজেদের আমলনামার হিসাব নিজেরাই গ্রহণ কর, চূড়ান্ত হিসাব দিবসে তোমাদের কাছ থেকে হিসাব গৃহীত হবার পূর্বেই। আর তোমরা তোমাদের আমলনামা মেপে নাও চূড়ান্ত দিনে মাপ করার পূর্বেই। কেননা আজকের দিনে নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করতে পারলে আগামীদিনের চূড়ান্ত মুহূর্তে তা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তাই সেই মহাপ্রদর্শনীর দিনের জন্য তোমরা নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে নাও, যেদিন তোমরা (তোমাদের আমলসহ)

উপস্থিত হবে এবং তোমাদের কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না'।[তিরমিযী হা/২৪৫৯, সনদ মওকূফ ছহীহ।]

অনুরূপভাবে হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, المؤمن قوّام على نفسه يحاسب نفسه لله، وإنما خفّ الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شقّ الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তিকে স্বীয় আত্মার পরিচালক হিসাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আত্মসমালোচনা করতে হবে। যারা দুনিয়াতে আত্মসমালোচনা করবে, ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের হিসাব হালকা হবে। আর যারা এ থেকে বিরত থাকবে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের হিসাব কঠিন হবে।[ইগাছাতুল লাহফান ১/৭৯।]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, أَعْقَلُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ تُتْرَكَهُ، وَأَنَارَ قَبْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْكِنَهُ، وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَنْ يَّلْقَاهُ وَصَلَّى الْجَمَاعَةَ قَبْلَ أَنْ تُصَلَّي عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، وَحَاسَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبَهُ 'সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সে-ই যে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে দুনিয়া তাকে পরিত্যাগ করার পূর্বেই। কবরকে আলোকিত করে কবরে বসবাস করার পূর্বেই। স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভের পূর্বেই, জামা'আতে ছালাত আদায় করে তার উপর জামা'আতে ছালাত (অর্থাৎ জানাযার ছালাত) পঠিত হবার পূর্বেই। নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করে হিসাব দিবসে তার হিসাব গ্রহণ করার পূর্বেই'।

মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেছেন, رحم الله عبداً قال لنفسه: ألست صاحبه كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. 'আল্লাহর রহম ঐ বান্দার প্রতি যে তার নফসকে (কোন মন্দ কাজের পর) বলে, তুমি কি এর সাথী নও? তুমি কি এর সঙ্গী নও? অতঃপর তাকে নিন্দা করে, অতঃপর তার লাগাম টেনে ধরে, অতঃপর আল্লাহর কিতাবের উপরে তাকে আটকে রাখে তখন সে হয় তার পরিচালক'।[ইগাছাতুল লাহফান ১/৭৯।]

মাইমুন বিন মিহরান বলেন,لا يكون العبد تقياً حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه 'কোন বান্দা প্রকৃত মুত্তাক্বী হ'তে পারে না, যতক্ষণ না অন্তরের হিসাব করে,
এমনকি অংশীদারের চেয়েও বেশী শক্ত করে হিসাব করে'।[তদেব]

আত্মসমালোচনার উপকারিতা:

১. নিজের দোষ-ত্রুটি নিজের সামনে প্রকাশ করার মাধ্যমে মানুষ স্বীয় ভুল-ত্রুটি জানতে পারে। ফলে তার হৃদয় ভাল কাজের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে পারে।

২. আত্মসমালোচনা দ্বীনের উপর দৃঢ়তা অর্জনের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম, যা মানুষকে আল্লাহর দরবারে মুহসিন ও মুখলিছ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে।

৩. আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নে'মতসমূহ, অধিকারসমূহ জানতে পারে। আর সে যখন আল্লাহর নে'মত ও তার অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তখন সে আল্লাহর নে'মতের শুকরিয়া আদায়ে উদ্বুদ্ধ হয়।

৪. আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষের মাঝে পরকালীন জওয়াবদিহিতার উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। মাইমুন বিন মিহরান বলতেন, 'মুত্তাক্বী ব্যক্তি সেই, যে নিজের জওয়াবদিহিতা এমন কঠোরভাবে গ্রহণ করে যেন সে একজন অত্যাচারী শাসক'।[ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/৩৯৫।]

৫. আত্মসমালোচনা জীবনের লক্ষ্যকে সবসময় সজীব করে রাখে। এর মাধ্যমে আমরা অনুভব করতে পারি আমাদেরকে এই পৃথিবীর বুকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। পার্থিব জীবন শুধু খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টার নয়, এ জীবনের পরবর্তী যে অনন্ত এক জীবন, তার জন্য যে আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে, আত্মসমালোচনা আমাদেরকে সর্বক্ষণ তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৬. মুহাসাবার ফলে কোন পাপ দ্বিতীয়বার করতে গেলে বিবেকে বাধা দেয়। ফলে পাপের কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

আত্মসমালোচনার পদ্ধতি :

আত্মসমালোচনা দু'ভাবে করা যায়। যথা-

(ক) আল্লাহর আদেশ সমূহ আদায়ের ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করা : আমাদের উপর নির্দেশিত ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলগুলি পর্যালোচনা করা। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আমি কি আমার উপর আরোপিত ফরযগুলি আদায় করেছি? আদায় করলে সাথে সাথে নফল বা মুস্তাহাবগুলি কতটুকু আদায় করেছি? কারণ ফরযের কোন অপূর্ণতা হ'লে নফলগুলি সেটা পূরণ করে দেয়।সাথে সাথে খেয়াল করতে হবে যে, উক্ত ইবাদতসমূহে আল্লাহর হক্ব পরিপূর্ণ আদায় করা হয়েছে কি-না? উল্লেখ্য যে, ইবাদতে আল্লাহর হক্ব ছয়টি- ক. আমলের মধ্যে খুলূছিয়াত থাকা, খ. তার মাঝে আল্লাহর জন্য নছীহত থাকা (আল্লাহর একত্বের প্রতি সঠিক বিশ্বাস পোষণ করা), গ. রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য থাকা, ঘ. একাগ্রতা থাকা, ঙ. নিজের উপর আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পূর্ণ উপলব্ধি থাকা, চ. অতঃপর এ সকল বিষয়াদির প্রতিটিতে নিজের ত্রুটি হচ্ছে- এই অনুতপ্তভাব থাকা।[. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৩৯৪।]

এ সকল হক্ব পূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে কি-না আমল সম্পন্ন করার পর তা চিন্তা করতে হবে।

(খ) অপ্রয়োজনীয় কাজ পরিত্যাগ করা : দ্বীনী দৃষ্টিকোণে যে হালাল কাজ করার চেয়ে না করাই বেশী উত্তম মনে হয়, তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। কোন নির্দোষ কিন্তু গুরুত্বহীন কাজ করে থাকলে তা থেকেও নিজেকে সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ আগামীতে কেন এটা করব? এর দ্বারা কি আমি আল্লাহর পথে আরো অগ্রসর হ'তে পারব? এর দ্বারা কি দুনিয়াবী ও পরকালীন জীবনে আমার বা মানবসমাজের কোন লাভ হবে? তা অন্য কোন লাভজনক কাজ থেকে আমাকে বিরত করছে কি? ইত্যাদি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পেলে সে পথে আর অগ্রসর না হওয়া।[. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৩৯৪।]

(গ) ক্ষমা প্রার্থনা করা ও সৎআমল করা : পূর্ণ সতর্কতার পরও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন পাপ হয়ে যায়, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তওবা করা। সাথে সাথে সৎআমল দ্বারা এই অপরাধের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ- 'নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে দূর করে দেয়, আর এটা স্মরণকারীদের জন্য স্মরণ' *(হূদ ১১/১১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর। কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে সৎআমল কর যাতে তা মিটে যায়'।[তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩।]

আত্মসমালোচনা না করার ফলাফল :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, মুহাসাবা পরিত্যাগ করার অর্থ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলা। এতে মানুষের অন্তর পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মুহাসাবা পরিত্যাগ করার ফলে দ্বীনের প্রতি তার শিথিলতা চলে আসে, যা তাকে নিশ্চিতভাবেই দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কেবলমাত্র আত্মগর্বী, প্রতারিত আত্মাই মুহাসাবা পরিত্যাগ করতে পারে। ফলশ্রুতিতে সে কোন কিছুর পরিণাম চিন্তা করে না। সমস্ত পাপ তার কাছে অত্যন্ত সহজ বিষয় হয়ে যায়। অবশেষে একসময় পাপ থেকে বেরিয়ে আসাটা তার কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কখনো যদি সে সৎপথের সন্ধান পায়ও, তবুও সে তার অন্যায় অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করে।[ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/৮২।]

সালাফে ছালেহীনের আত্মসমালোচনার দৃষ্টান্ত :

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, خَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ فِيْ جَوْفِ الْحَائِطِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بَخٍ بَخٍ وَاللهِ لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ অর্থাৎ 'আমি একবার ওমর (রাঃ)-এর সাথে বের হ'লাম। পথিমধ্যে তিনি একটি বাগানে ঢুকলেন। এমতাবস্থায় আমার ও তাঁর মধ্যে বাগানের একটি দেয়াল আড়াল হয়েছিল। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব! আমীরুল মুমিনীন সাবাস! সাবাস! আল্লাহর শপথ! হে ইবনুল খাত্তাব! অবশ্যই তোমাকে আল্লাহর ভয়ে ভীত হ'তে হবে। অন্যথা তিনি তোমাকে শাস্তি দিবেন'।[মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৬৩৮, আল-বিদায়াহ ৭/১৩৫।]

ওছমান (রাঃ) যখন কোন কবরের নিকট দাঁড়াতেন তখন তিনি কাঁদতেন। যাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাকে বলা হ'ল জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনায় আপনি কাঁদেন না, অথচ কবর দেখলে আপনি কাঁদেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূল (ছঃ) বলেছেন যে, 'কবর হ'ল পরকালের পথের প্রথম মনযিল। যদি এখানে কেউ মুক্তি পায় তাহ'লে পরের মনযিলগুলি তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যদি এখানে মুক্তি না পায় তাহ'লে পরেরগুলি আরও কঠিন হয়ে

যায়'। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কবরের চাইতে ভয়ংকর কোন দৃশ্য আর দেখিনি'।[তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২, 'কবরের আযাবের প্রমাণ' অনুচ্ছেদ ।]

বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একদল লোককে দেখতে পেয়ে বললেন, ওরা কি উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে? একজন বললেন, এরা একটি কবর খুড়ছে। রাবী বলেন, একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) আতংকিত হয়ে পড়লেন এবং সঙ্গী-সাথীদের আগে দ্রুতবেগে কবরের নিকটে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসলেন। রাবী বলেন, তিনি কি করছেন তা দেখার জন্য আমি তাঁর মুখোমুখি বসলাম। তিনি কেঁদে ফেললেন, এমনকি অশ্রুতে মাটি ভিজে গেল। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসে বললেন, হে ভাইয়েরা! এ রকম দিবসের জন্য রসদ প্রস্তুত রেখো'।[আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৫১।]

হানযালা আল-উসাইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি কাঁদতে কাঁদতে আবুবকর (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে হানযালা! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, হে আবুবকর! হানাযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। আমরা যখন রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে অবস্থান করি এবং তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নাম স্মরণে নছীহত করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। কিন্তু বাড়ী ফিরে আসার পর স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর

কসম! আমাদেরও তো একই অবস্থা! চল আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যাই। অতঃপর আমরা সেদিকে রওয়ানা হ'লাম। রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হানযালা! কি খবর? তখন উত্তরে তিনি অনুরূপ বক্তব্যই পেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার নিকট থেকে তোমরা যে অবস্থায় প্রস্থান কর, সর্বদা যদি সেই অবস্থায় থাকতে তাহ'লে ফেরেশতারা অবশ্যই তোমাদের মজলিসে, বিছানায় এবং পথে-ঘাটে তোমাদের সাথে মুছাফাহা করত। হে হানযালা! সেই অবস্থা তো সময় সময় হয়েই থাকে'।[মুসলিম হা/২৭৫০, মিশকাত হা/২২৬৮।]

উপরোক্ত হাদীছগুলি থেকে আত্মসমালোচনায় গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আবশ্যকতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

আত্মসমালোচনা আমাদের পার্থিব জীবনে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে, পরকালীন জওয়াবদিহিতার চিন্তা বৃদ্ধি করে এবং বিবেককে শাণিত করে। করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সাহায্য করে। সর্বোপরি জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠার কাজে সর্বদা প্রহরীর মত দায়িত্ব পালন করে।

আত্মসমালোচনা, অন্যের ত্রুটি ধরার পূর্বে নিজের ত্রুটি ধরতে আমাদের শিক্ষা দেয়। অন্যের নিন্দা করার পূর্বে নিজের মধ্যে বিদ্যমান খারাপ দূর করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর দ্বারা আমরা

নিজেদেরকে যেমন সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা চালাতে পারব, তেমনি অন্যের মাঝে ভুল দেখতে পেলে ভালবাসা ও স্নেহের সাথে তাকেও শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারব। এভাবে সমাজ পরিণত হবে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালবাসা ও সৌহার্দ্যে পূর্ণ এক শান্তিময় সমাজ।

রেফারেন্স : আত্মসমালোচনা : গুরুত্ব ও পদ্ধতি
"*মাসিক আত- তাহরীক*" এর *মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* এর লেখনী হতে সংগ্রীহিত

২০.মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা

সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ, প্রচার, নসিহত, ওয়াজ বা আল্লাহর দ্বিন পালনের পথে আহ্বান করাই ছিল সব নবী ও রাসুলের দায়িত্ব। সব নবী তাঁর উম্মতকে তাওহিদ ও ইবাদতের আদেশ করেছেন। শিরক, কুফর ও পাপকাজ থেকে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজিলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদের সৎ কাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন।

(সুরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭)

এই দাওয়াতি কার্যক্রমের কর্মপন্থা কী হবে—এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আপনি আপনার রবের দিকে আহ্বান করুন হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা, সুন্দর ওয়াজ-উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।’ (সুরা : নাহল, আয়াত : ১২৫)

কোরআনুল কারিমে বারবার বলা হয়েছে যে প্রচার বা পৌঁছানোই নবী-রাসুলদের একমাত্র দায়িত্ব। ইরশাদ হয়েছে : ‘রাসুলদের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।’

(সুরা : নাহল, আয়াত : ৩৫)

এ আয়াতে দাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি উল্লিখিত হয়েছে। যথা-

(১) হিকমত তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দাওয়াত দেওয়া। (২) উত্তম উপদেশ দেওয়া। (৩) উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে। প্রথমে তাওহীদের প্রতি মানুষকে আহবান করতে হবে। কেননা ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। পরে ইসলামের যাবতীয় বিধান সম্পর্কে ছহীহ সুন্নাহর আলোকে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضى الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم-ْ

ইবনু আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মু‘আয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসাবে) প্রেরণ করেন। এ সময় তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করাবে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করাবে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পদে ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে আর দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে’।(সহিহ মুসলিম, ৪৯)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়সংগত কাজের আদেশ দাও এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনো...।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)

প্রকৃত মুমিন শুধু নিজেই ইবাদত করেই ক্ষ্যান্ত হয় না, সে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকে। প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, ‘আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে।

শিগগির আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’

(সুরা : তাওবা, আয়াত : ৭১)

দ্বিন প্রচারের দায়িত্ব পালনকারী মুমিনদের সর্বোত্তম মানুষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘ওই ব্যক্তির চেয়ে কথায় কে উত্তম—যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলমানদের একজন।’

(সুরা : ফুসসিলাত, আয়াত : ৩৩)

আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীর যেসব গুণাবলী থাকা আবশ্যক :

সত্যবাদী হওয়া : আল্লাহর পথের দাঈকে অবশ্যই সত্যবাদী হ’তে হবে। দাঈর মধ্যে যদি মিথ্যার লেশমাত্র পাওয়া যায় তাহ’লে তার দাওয়াত ফলপ্রসু হবে না। কুরআন ও হাদীছে সত্যবাদিতার বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং মুমিনদেরকে সত্যবাদীদের সাথী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক’ (তওবা ৯/১১৯)।

ধৈর্যশীল হওয়া : ধৈর্য মহৎ গুণ। আল্লাহর পথের দাঈদের এই মহৎ গুণে গুণান্বিত হ’তে হবে। নচেৎ দাওয়াত দানে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দিতে গেলে অনেক বিপদ আসতে পারে, সেক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে তা মোকাবিলা করতে হবে। আল্লাহ বলেন,وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- ‘সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যাদের উপরে কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই আমরা ফিরে যাব’ (বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৬)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ‘নিশ্চয়ই যারা ধৈর্যশীল, তারা তাদের পুরস্কার পায় অগণিত’ (যুমার ৩৯/১০)।

কোমল স্বভাবের অধিকারী হওয়া : নম্রতা-ভদ্রতা ও কোমলতা আদর্শ মানুষের গুণ। দ্বীনের দাঈর মধ্যে অবশ্যই এ গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। এ গুণের অধিকারী দাঈগণ দাওয়াতী কাজে সহজে মানুষের মাঝে প্রভাব ফেলতে পারে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কোমলতা অর্জনের নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে। ফেরাঊনের সাথে কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে বলেন, اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى- 'তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকটে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালংঘণ করেছে। অতঃপর তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বল। সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীতি অবলম্বন করবে' (ত্ব-হা ৩৯/৪৩-৪৪)। রাসূল (সা)-কে আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-

'আর আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

দ্বীনী কাজে একনিষ্ঠ হওয়া : দ্বীনি কাজে একনিষ্ঠতা ব্যতীত কখনও দাওয়াতী কাজে সফলতা আসবে না। আর ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ- 'বল, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি' (যুমার ৩৯/১১)।

কথায় ও কাজে মিল থাকা : আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُوْن 'হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা কর না? তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক' (ছফ ৬১/২-৩)। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسرِيَ بِيْ رِجَالاً تُقْرَضُ شَفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ يَعْقِلُوْن.

'যখন আমাকে মে'রাজের রাতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি কিছু লোককে দেখলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে দেওয়া হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিব্রীল! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আপনার উম্মতের বক্তাগণ, যারা মানুষকে ভাল কাজের জন্য আদেশ করত এবং নিজেদেরকে ভুলে যেত, অথচ তারা কুরআন তেলাওয়াত করত। কিন্তু তারা চর্চা করত না'। (*আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩২৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯১*)

অন্যত্র তিনি বলেন, يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيْه.

'ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে

যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হ'তে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম'। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯, বাংলা মিশকাত, ৯ম খন্ড হা/৪৯১২ 'আদব' অধ্যায়, 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ।)

তমসাচ্ছন্ন এই সমাজ অজ্ঞতা, হীনতা, হিংসা-বিদ্বেষ, খুন-খারাবী, নগ্নতা ও বেহায়াপনার মত জঘন্য পাপাচারে নিমজ্জিত। সমাজের এহেন পরিস্থিতি মোকাবিলায় আল্লাহর পথে দাওয়াত দানের কোন বিকল্প নেই। দাওয়াতের মাধ্যমেই একটি সুষ্ঠু-সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব। এ কাজে সবাইকে এগিয়ে আসা এখন সময়ের অনিবার্য দাবী।

২১.কবর যিয়ারত

কবর মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভেসে ওঠে পরকালীন জীবন তথা জান্নাত কিংবা জাহান্নামের কথা। যা মানুষকে দুনিয়া বিমুখতা এনে দেয় এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মৃত্যুর চিন্তা আত্মাকে বিদগ্ধ করে।

ফলে পরকালমুখী জীবনযাপনের প্রতি মানুষ আত্মতাড়িত হয়। একই সঙ্গে তাওবা করে গুনাহমুক্ত থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা তৈরি হয়। আগ্রহ জন্মে সৎ আমলের প্রতি। ফলে পরকালমুখী জীবনযাপনের প্রতি মানুষ আত্মতাড়িত হয়। একই সঙ্গে তাওবা করে গুনাহমুক্ত থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা তৈরি হয়। আগ্রহ জন্মে সৎ আমলের প্রতি।

ইসলামের শুরুর দিকে কবর জিয়ারতের অনুমতি না থাকলেও পরে হজরত মুহাম্মদ (সা.) কবর জিয়ারতের অনুমতি দেন।

সুনানে ইবনে মাজাহতে উল্লিখিত এক হাদিসে তিনি বলেন, 'তোমাদের কবর জিয়ারতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে কবর জিয়ারত করো। কেননা, তা দুনিয়া বিমুখতা এনে দেয় এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'

কবর জিয়ারতের দোয়া

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনার কবরবাসীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যে দোয়াটি তিনি পাঠ করেন তা হলো—

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ

বাংলা উচ্চারণ : 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর; ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম, আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছার।'

অর্থ : হে কবরবাসী! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের আগে তোমরা কবরে গেছ এবং আমরা পরে আসছি। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১০৫৩)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি কবর জিয়ারতে গিয়ে বলেন,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ

বাংলা উচ্চারণ : আসসালামু আলাইকুম দার ক্বাওমিম মুউমিনি না ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুনা। অর্থ : মুমিন ঘরবাসীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ, আমরা আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো। (সহিহ মুসলিম : ২৪৯)

কবর জিয়ারতের নিয়ম

কবরস্থানে সর্বপ্রথম জিয়ারতের দোয়া পড়া। এরপর কবরবাসীর ইসালে সওয়াবের নিয়তে দরুদ শরিফ ও বিভিন্ন সুরা ইত্যাদি আদায় করা। মৃতের বা কবরবাসীর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা।

কবর জিয়ারতের ফজিলত

হাদিসে কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে কিছু সুরার বিশেষ ফজিলতের কথা উল্লেখ আছে। এমনকি দরুদ শরিফের ফজিলতের কথাও রয়েছে। তাই দরুদ শরিফ, সুরা ফাতিহা, সুরা ইখলাস, আয়াতুল কুরসি ও অন্য যেসব সুরা সহজ মনে হয়, সেগুলো আদায় করা।

কবর সামনে রেখে দুই হাত তুলে দোয়া করা উচিত নয়। তাই কবরকে পেছনে রেখে কিংবা কবরের দিকে পিঠ দিয়ে এরপর কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতে হবে। আবার কেউ চাইলে হাত না তুলে মনে মনেও দোয়া করতে পারেন, তাতে জিয়ারত হয়ে যাবে।কবর জিয়ারত করা বছরের যে কোনো দিন যেকোনো সময় জায়েজ আছে। তবে কেউ যদি বিশেষ কোনো দিন বা রাতকে জিয়ারতের জন্য নির্ধারণ করে নেয় এবং সবসময় সেভাবেই করে তাহলে তা বিদ'আত হিসেবে পরিগণিত হবে।

যেমন দু ঈদের দিন, জুমার দিন, শবে কদর বা কথিত শবে বরাতের ইত্যাদি।

কবর জিয়ারতের সুন্নতি নিয়ম হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি যার যখন সুবিধা হবে তখন কবরের সন্নিকটে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দুই হাত উত্তোলন করে অথবা না করে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করবে। এর আগে কবরে গিয়ে সালামের সুন্নতি দোয়া পাঠ করবে।

উল্লেখ্য যে, অধিক বিশুদ্ধ মতানুসারে মহিলাদের জন্য কবরস্থানে গিয়ে কবর জিয়ারত করা ঠিক নয়। তবে তারা বাড়ি থেকেই মৃতদের জন্য দোয়া করবে।

২২.তাওবা করতে থাকা

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাদের এক বিশেষ গুণ। মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে বসে, আল্লাহ তাআলার মরজি মোতাবেক চলার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে, তাই আল্লাহ তাআলা তার সে ভুল বা গুনাহ থেকে মুক্তিদানের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন। এই তাওবা ও ইস্তিগফার একজন মুমিনকে দান করে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ জীবন। মুমিনকে সর্বদা গুনাহমুক্ত জীবনের প্রতি করে অনুপ্রাণিত। মুমিনকে নিয়ে যায় ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে উন্নতি ও মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে।

তাই তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনের জীবনের এক অপরিহার্য বিষয়। তাকওয়াপূর্ণ ও গুনাহমুক্ত জীবন লাভ করতে যা একান্ত জরুরি। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে মুত্তাকীদের গুণাবলির বর্ণনা দিয়ে বলেন—

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ.

এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি যুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে— আর আল্লাহ ছাড়া কেইবা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে। আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না। —সূরা আলে ইমরান (০৩) : ১৩৫

তাওবা ও ইস্তিগফার নবীদের সুন্নত

নবী-রাসূলগণ নিজেরা যেমন আপন রবের কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করেছেন, উম্মতকেও তাওবা ও ইস্তিগফার করতে আদেশ করেছেন। তাওবা-ইস্তিগফার শিক্ষা দিয়েছেন। যদিও নবী-রাসূলগণের তাওবা-ইস্তিগফার ও উম্মতের তাওবা ইস্তিগফারের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কারণ নবী-রাসূলগণ মা'সূম ও নিষ্পাপ। তাঁদেরকে আল্লাহ গুনাহ থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁদের উম্মত তো মা'সূম ও নিষ্পাপ নয়। তাই নবীগণের তাওবা ও ইস্তিগফার হয়ে থাকে কেবলমাত্র নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। আর উম্মতের তাওবা ও ইস্তিগফার তো কখনো নিজেদের গুনাহের ক্ষমার জন্য, আবার কখনো নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে।

নবীগণের তাওবা ও ইস্তিগফার

নবীগণও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করেছেন। তাদের তাওবা ও ইস্তিগফারের ঘটনা ও ভাষা কুরআন মাজীদে বিবৃত হয়েছে। আমরা এখানে কুরআন থেকে কয়েকজন নবীর তাওবা ও ইস্তিগফারের বর্ণনা তুলে ধরছি।

হযরত আদম আ.-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.ؕ

হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তভুর্ক্ত হয়ে যাব। সূরা আ'রাফ (০৭) : ২১

হযরত নূহ আ.-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِیْنَ اِلَّا تَبَارًا.

হে আমার রব! আপনি আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং আমার ঘরে যারা ঈমানের সঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং মুমিন নর-নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি যালেমদেরকে ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। —সূরা নূহ (৭১) : ২২

হযরত মূসা আ.-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَغَفَرَ لَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.ؕ

হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতি যুলুম করেছি। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তাই তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। —সূরা কাসাস (২৮) : ২৪

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ.ؕ

হযরত আগার ইবনে ইয়াসার আলমুযানী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। কেননা আমি দিনে একশত বার তাওবা করি। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭০২

এখানে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত বান্দা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের গোটা জীবন আল্লাহ তাআলার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তাই তারা যাবতীয় গুনাহ থেকে দূরে থেকে জীবন যাপন করেন। তাদের থেকে কখনও সগীরা বা কবীরা গুনাহ সংঘটিত হয়নি। এজন্যই আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্ববাদী আকীদা হল, নবী ও রাসূলগণ মা'সূম ও নিষ্পাপ। তাই আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের মুখে তাওবা ও ইস্তিগফার উচ্চারিত হওয়ার অর্থ কখনোই এ নয় যে, তারা তাদের গুনাহের জন্য বা নবুওতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তারা তাওবা ও ইস্তিগফার করে থাকেন; বরং তারা তো তাওবা ও ইস্তিগফার করেন আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বা তাঁদের থেকে অধিক উত্তম কাজের তুলনায় কম উত্তম কাজ সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং সঙ্গে সঙ্গে উম্মতকে তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

নবীগণ তাদের উম্মতকে তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষা দিয়েছেন

হযরত সালেহ আ. কতৃর্ক তাঁর উম্মতকে তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষাদান :

وَ اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِیْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَیْهِ ؕ اِنَّ رَبِّیْ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ.

আমি ছামুদ জাতির কাছে সালেহকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তোমাদেরকে তাতে বসবাস করিয়েছেন। তাই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার রব অতি নিকটে এবং দুআ কবুলকারী। —সূরা হুদ (১১) : ৬১

এভাবে সকল নবী উম্মতকে আল্লাহর দরবারে নিজেদের ভুলত্রুটি ও গুনাহের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করার আদেশ করেছেন এবং নিজেদের জীবনকে শিরকের গুনাহ থেকে শুরু করে সকল গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষা দিয়েছেন। তাই দ্বীন ও শরীয়তে তাওবা ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব অপরিসীম।

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও দয়া লাভে সাহায্য করে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ.

আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। —সূরা বাকারা (০২) : ১৯৯

তিনি আরও বলেন—

وَ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَیْهِ ؕ اِنَّ رَبِّیْ رَحِیْمٌ وَّدُوْدٌ.

তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর কাছে ফিরে আস। নিশ্চয়ই আমার রব অতি দয়ালু ও অধিক মমতাময়।—সূরা হুদ (১১) : ৯০

তাওবা ও ইস্তিগফারকারীদের প্রতি আল্লাহ শাস্তি প্রেরণ করেন না

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِیْهِمْ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ

আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় কিছুতেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায়ও তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। —সূরা আনফাল (০৮) : ৩৩

এমনকি তাওবা-ইস্তিগফারের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো জাতির উপর শাস্তি আসার প্রতিশ্রূতি দেওয়ার পরও সে শাস্তিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে হযরত ইউনুস আ.-এর কওমের ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْیَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ اِیْمَانُهَاۤ اِلَّا قَوْمَ یُوْنُسَ ؕ لَمَّاۤ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰی حِیْنٍ

কেন কোনো জনপদ(বাসীরা) ঈমান আনয়নকারী হল না? তাহলে তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত। তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতিক্রম। তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি পার্থিব জীবনে তাদের উপড় থেকে লাঞ্ছনার আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে একটা সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম। —সূরা ইউনুস (১০) : ৯৮

হযরত ইউনুস আ. তাঁর কওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে বহুভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন; কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিল না। বরং তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনে ডুবে থাকল। তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আসার প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে দিলেন। হযরত ইউনুস আ. যেহেতু বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের উপর তো এখন শাস্তি আসা অবধারিত, তাই তিনি নিজ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। তারা হযরত ইউনুস আ.কে যখন খুঁজে পেল না তখন তারা বুঝতে পারল যে, এখন তো আমাদের উপর শাস্তি এসেই যাবে। তাই তারা তাওবা-ইস্তিগফার করতে লাগল। তাদের এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তাআলা আর শাস্তি প্রেরণ করলেন না। এভাবে তারা তাওবা ও ইস্তিগফারের ফলে আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে গেল।

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনের পার্থিব নিআমত, শক্তি সামর্থ্য ও যাবতীয় সমৃদ্ধি লাভে সাহায্য করে

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا، يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا، وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُم اَنْهٰرًا.

আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য বিভিন্ন উদ্যান ও নদ-নদী সৃষ্টি করে দেবেন। —সূরা নূহ (৭১) : ১০-১২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَ يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْن.َ

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর কাছে তাওবা কর। তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। তোমাদের শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না। —সূরা হুদ (১১) : ৫২

এভাবে কুরআন মাজীদ তাওবা ও ইস্তিগফারের অনেক ফায়দা ও উপকারের কথা তুলে ধরেছে। তাই আল্লাহ তাআলার ক্ষমা, দয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সব দিক থেকে তাঁর সাহায্য লাভ করার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের বিকল্প নেই।

তাওবা ও ইস্তিগফারের উপকারিতায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: مَنْ لَزِمَ الاستغفارَ جَعَلَ الله له من كل ضيق مَخرَجاً، ومن كل هم فرَجاً، ورزَقَه من حيث لا يحتسب.

যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে আল্লাহ তাআলা তার সকল সংকট থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেন, তার সকল পেরেশানী দূর করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস **১৫১৮**

মোটকথা, তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে একজন মুমিনের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সফল হয়। এর মাধ্যমে একজন মুমিন লাভ করে উভয় জাহানের সমৃদ্ধি। সর্বোপরি তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহ তাআলার নিকটতম বান্দায় পরিণত হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের সগীরা-কবীরা গুনাহসহ সব ধরনের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করেন।

রেফারেন্স :

বর্ষ: ১৯, সংখ্যা: ০৩

শাবান-রমযান ১৪৪৪ // মার্চ-এপ্রিল ২০২৩

আনওয়ারুল কুরআন

আলকুরআনের দৃষ্টিতে তাওবা ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব ও ফযীলত

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম

২৩.ওছিয়ত লিখে রাখা

মৃত্যুর আগে নিজের সম্পদের সুষম বণ্টনের অসিয়ত লিখে রেখে যাওয়া জরুরি। যাতে তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশ ও পাড়া-প্রতিবেশিরা তার রেখে যাওয়া সম্পদ তারই লিখে রেখে যাওয়া ওছিয়ত অনুযায়ী বণ্টন করতে পারে।

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه" . ُ

ইবনু ‘উমার (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির কিছু অর্থ সম্পদ রয়েছে, আর সে এ সম্পর্কে ওয়াসিয়্যাত করতে চায়, সে মুসলিম ব্যক্তির উচিত হবে না ওয়াসিয়্যাত লিখে না রেখে দু’টি রাতও অতিবাহিত করা। (ই.ফা. ৪০৫৮, ই.সে. ৬ষ্ঠ খন্ড -৪০৫৭)

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪০৯৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসের দাবি হল, মুসলমানকে তার প্রতিদিনের কাজ-কারবার ছাফ রাখতে হবে। কারো সাথে কোনো দেনা-পাওনা থাকলে তা লিখে ওছিয়ত করে রাখবে। একজন মুসলিম পার্থিব জীবনে এমনভাবে থাকবে, যেভাবে একজন সিপাহী সীমান্তচৌকিতে পাহারারত থাকে। যে কোনো মুহূর্তে তার প্রস্থানের নির্দেশ আসুক সে এর জন্য প্রস্তুত থাকে।
তো এখানে ওছিয়ত সংক্রান্ত কিছু মাসায়েল উল্লেখ করা মুনাসিব মনে হচ্ছে।

এক. ঋণ পরিশোধের ওছিয়ত
যে সকল হক আদায় করা ওয়াজিব তার জন্য ওছিয়ত করাও ওয়াজিব। যেমন, একজন ঋণ নিয়েছে। এখন তার কর্তব্য হল, এই ওছিয়ত করে রাখা যে, তার সম্পদ থেকে যেন এ ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, ঋণের খবর ঘরের লোকদেরও জানা থাকে না। এমতাবস্থায় তার মৃত্যুর পর জানা না থাকার কারণে কাছের লোকেরাও তা পরিশোধ করতে পারে না। ফলে এ হক তার যিম্মায় থেকেই যায়। ঋণও শোধ হয় না। সেও দায়মুক্ত হতে পারে না।

দুই. নামায-রোযার ফিদয়ার ওছিয়ত

কারো জীবনে কোনো নামায-রোযা কাযা হয়ে থাকলে জীবদ্দশাতেই তা আদায় করে ফেলা উচিত। খোদানাখাস্তা যদি কাযা আদায়ের সুযোগ না পাওয়া যায় তাহলে এমর্মে ওছিয়ত করে যাওয়া ফরয যে, আমরা যিম্মায় এত নামায, এত রোযা কাযা রয়েছে। এগুলোর ফিদয়া যেন আদায় করা হয়। যদি কেউ এমন ওছিয়ত না করে তাহলে যে কঠিন গুনাহগার হবে।

তিন. যাকাত আদায়ের ওছিয়ত

কারো উপর কয়েক বছরের যাকাত ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও সে আদায় করেনি। তার কর্তব্য বিগত বছরগুলোর হিসাব করে যাকাত আদায় করা। জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ আদায় করতে না পারলে মৃত্যুর পূর্বে অন্তত ওছিয়ত করে যাবে যে, আমার এ পরিমাণ যাকাত অনাদায়ী রয়েছে। তা যেন আদায় করা হয়। অন্যথায় গুনাহগার হবে।

চার. বদলি হজ্বের ওছিয়ত

কারো উপর হজ্ব ফরয হয়েছে। কিন্তু আদায় করতে পারেনি। তার কর্তব্য হল, বদলি হজ্বের ওছিয়ত করে যাওয়া। ওছিয়ত না করলে দ্বিগুণ গুনাহ হবে। প্রথমত ফরয আদায় না করার গুনাহ। দ্বিতীয়ত মৃত্যুর পূর্বে ওছিয়ত না করে যাওয়ার গুনাহ।

ওছিয়ত পূরণে জীবিতদের করণীয়

জীবিতদের কর্তব্য, মৃতব্যক্তির জায়েয ওছিয়ত পুরা করা। তবে মৃতব্যক্তি কোনো নাজায়েয ওছিয়ত করলে তা পুরা করা হারাম।

কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধের ওছিয়ত করে গেলে জীবিতদের ঐ ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এর জন্য মৃতের সমস্ত সম্পত্তির প্রয়োজন হলেও।

কেউ যদি কোনো নেক কাজে সম্পদ ব্যয় করার ওছিয়ত করে যায়; যেমন, আমার সম্পত্তি দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করবে, কোনো মাদরাসায় ব্যয় করবে, কুরআন মাজীদ বিতরণ করবে, বিধবা-এতিমের জন্য এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে, এমতাবস্থায় তার কাফন-দাফনের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা সম্পন্ন করা জরুরি। ওয়ারিছগণ তা সম্পন্ন না করলে গুনাহগার হবে। তবে এ ওছিয়ত পুরা করতে যদি এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তির প্রয়োজন পড়ে, তাহলে অতিরিক্তটা ব্যয় করা আবশ্যক নয়। ওয়ারিসগণের ইচ্ছা। চাইলে স্বেচ্ছায় ব্যয় করবে, নইলে না। অবশ্য কোনো ওয়ারিস যদি নাবালেগ হয়, তাহলে তার অংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশের অধিক গ্রহণ করা কোনোভাবেই জায়েয হবে না।

কারো যিম্মায় নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত কাযা রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে যদি সে ওছিয়ত করে যায়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে ওছিয়ত পুরা করতে হবে। যদি তা পুরা করতে আরো বেশি সম্পদের প্রয়োজন হয় তাহলে তা পুরা করা যদিও ওয়ারিসদের উপর ওয়াজিব নয়, কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিসগণের কর্তব্য, নিজেদের অংশ থেকে তা আদায় করে দেওয়া।

গায়রে ওয়ারিসের জন্য ওছিয়ত করতে হলে

ওয়ারিস নয় এমন কাউকে নিজের সম্পত্তি থেকে কিছু দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তির জন্য ওছিয়ত করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তির চার ছেলে। জীবদ্দশায় তার এক ছেলের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। বাকি তিন ছেলে তার মৃত্যুর সময় জীবিত ছিল। তো তার মৃত্যুর পর তিন ছেলের মাঝে বণ্টন হবে। শরীয়ত তার মৃত ছেলে বা মৃত ছেলের সন্তানদের জন্য কোনো অংশ নির্ধারণ করে দেয়নি। এখন এ ব্যক্তি যদি তার মৃত ছেলের সন্তানদেরকে সম্পত্তি থেকে ভাগ দিতে চায়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে তাদের ব্যাপারে ওছিয়ত করে যাবে যে, আমার সম্পদের এই পরিমাণ তাদেরকে দেওয়া হবে। তবে কোনো ওয়ারিসের ক্ষেত্রে এরকম ওছিয়ত কার্যকর হবে না।

২৪.আখিরাত ও তার ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করা

আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, যখন একজন মুসলিম তার আখিরাতের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করবে। সে চিন্তা করবে ঐ সকল পরিস্থিতি নিয়ে, যা প্রতিটি মানুষের জীবনে অবশ্যই আসবে। সে চিন্তা করবে তার মৃত্যু নিয়ে। চিন্তা করবে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া, আখিরাতে পাড়ি দেওয়া জীবন নিয়ে। চিন্তা করবে একদিন তাকে পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। কিয়ামতের সে দিনটি আসন্ন। সেদিন একা থাকতে হবে, কেউ পাশে থাকবে না। না পরিবার, না স্ত্রী, পুত্র, আপনজন কেউ সেদিন সঙ্গী হবে না। সেদিন না কোনো ধন-সম্পদ কাজে আসবে। না কাজে আসবে দুনিয়ার কোনো সম্পর্ক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে। " (সূরা শুআরা: ৮৮-৮৯)

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

"যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে। এবং কাফের বলবে, হায়, আফসোস আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!" (সূরা নাবা: ৪০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত চিন্তা করা যে, আখিরাতের জন্য সে কী প্রেরণ করেছে। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। " (সূরা হাশর: ১৮)

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى - وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى - فَأَمَّا مَنْ طَغَى - وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى - وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

"যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে। এবং প্রত্যেক দর্শকের

সামনে জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে। তখন যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করত এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখত, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।" (সূরা নাযিআত: ৩৫-৪১)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ - وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ - وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ - أُولَئِكَ هُمُ

الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

"সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। সহাস্য ও প্রফুল্ল। এবং সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ধুলো ধূসরিত। কালিমা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।" (সূরা আবাসা: ৩৪-৪২)

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ - لِيَوْمٍ عَظِيمٍ - يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে।"(সূরা মুতাফফিফীন: ৪-৬)

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحِيَاتِي - فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ - وَلَا
يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد

"এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কী কাজে আসবে? সে বলবে- হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম। সেদিন তাঁর (আল্লাহর) মতো শাস্তি কেউ দেবে না। এবং তাঁর বাঁধার মতো বাঁধবারও কেউ থাকবে না। " (সূরা ফজর: ২৩-২৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطُّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ لَوْ عَلِمْتُمْ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَخَرَجْتُمْ عَلَى، أَوْ إِلَى

الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ

"আমি এমন জিনিস দেখি, যা তোমরা দেখ না। এমন জিনিস শুনি, যা তোমরা শুনতে পাও না। আসমানকে গুটিয়ে নেওয়া হলো। আর সে তো গুটিয়ে যেতে বাধ্য। (আমি দেখলাম) সেখানে চার আঙুল পরিমাণও জায়গা নেই। যেখানে আল্লাহর জন্য সিজদাবনত ফেরেশতাগণের কপাল লাগেনি। আল্লাহর শপথ, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে; তাহলে তোমরা কম হাসতে বেশি কাঁদতে। বিছানায় নারীর সঙ্গ উপভোগ করতে না। তোমরা পাহাড়ের দিকে চলে যেতে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে। " (মুসনাদে আহমাদ: ২১৫১৬: সুনানে তিরমিযী: ২৩১২)

* জাহান্নামের সবচেয়ে সহজ আযাব

নু'মান ইবনে বাশীর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন-

"নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ ও নিম্নমানের আযাব হবে এমন ব্যক্তির, যার দুই পায়ে আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে। যার কারণে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। আর সে মনে করবে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কাউকে দেওয়া হয়নি। অথচ সেটাই হলো সবচেয়ে লঘু শাস্তি। " (সহিহ বুখারী :৬৫৬১; সহীহ মুসলিম:২১৩)

* জাহান্নামের গভীরতা

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ : تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالَ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا

فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথেই ছিলাম। তখন তিনি কোনো কিছুর পতন-আওয়াজ শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটা কীসের আওয়াজ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা একটা পাথর, যা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সত্তর বছর আগে আর তা এখন জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে ঠেকল। আর তোমরা এখন তার পতন-আওয়াজ শুনলে। (সহিহ মুসলিম :২৮৪৪)

জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، قَالَ: فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ

مِثْلُ حَرِّهَا

"তোমাদের আগুন (তোমরা যে আগুন দেখ) জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। তখন বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, দুনিয়ার আগুনই তো পাপীর জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, এ আগুনকে আরও নিরানব্বই গুণ বৃদ্ধি করা হবে, প্রত্যেক অংশের উত্তাপই সমান হবে।" (সহীহ বুখারী: ৩২৬৫)

জাহান্নামের আযাবের কথা জানার পর আপনার হৃদয় কি একটু হলেও কেঁপে উঠেছে? বিষয়গুলো চিন্তা করি -

- মৃত্যু ও তার যন্ত্রণা।
- কবর ও তার অন্ধকার।
- কিয়ামতের দিন ও তার ভয়াবহ পরিস্থিতি।
- হিসাব-নিকাশ ও সে সময়ের আফসোস।

- মিজান ও তার সূক্ষ্মতা।

- পুলসিরাত ও তার তীক্ষ্ণতা।

- আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া এবং তাঁর বড়ত্ব।

- জাহান্নামের আযাব ও তার ভয়াবহতা।

* আদম সন্তানের বিষয়টা সত্যিই আশ্চর্যজনক

দুনিয়ার রাজা-বাদশা, এমনকি সামান্য ক্ষমতাধরের সাথে দেখা করতে গেলেও সে কত প্রস্তুতি গ্রহণ করে, কত যে সতর্কতার সাথে পা বাড়ায়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যিনি রাজাধিরাজ আসমান-জমিনের প্রতিশ, তার তাঁর নিকট যাওয়া ও তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে, সে জন্য কোনো ধরনের প্রস্তুতি নেই! নেই কোনো সতর্কতা!

আমরা কি জান্নাতে যেতে চাই? আমাদের কি জান্নাতের প্রতি আগ্রহ আছে? আমরা কি জানি, আল্লাহ জান্নাতে কত ধরনের নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন? জান্নাতের হুর কেমন? জান্নাতের প্রাসাদ, জান্নাতের গাছপালা, বাগ-বাগিচা, জান্নাতের নদী কেমন?...

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"এবং তথায় রয়েছে এমন সব বস্তু, যা মনে চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।" (সুরা যুখরুফ; আয়াত ৭১)

শায়খ সা'দী রাযি. বলেছেন-

"জান্নাতে রয়েছে {مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُن} এই বাক্যটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অর্থ বহনকারী বাক্য। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, সকল ভোগ্য-বস্তু,

আনন্দ, চোখ জুড়ানো, মন ভুলানো সকল কিছু- মনের চাহিদামাফিক সকল বস্তু এখানে পাওয়া যাবে। চাই তা হোক খাদ্য বা পানীয় কিংবা পোশাক-আশাক, চোখের প্রশান্তি, জৈবিক চাহিদা পূরণ, নয়নাভিরাম দৃশ্য, গাছপালা, সজ্জিত-সুশোভিত নেয়ামতরাজি। সবই অর্জিত হবে এখানে। এ সবই জান্নাতিদের জন্য প্রস্তুত। সুন্দর করে, উত্তমভাবে। সবই প্রস্তুত, চাই শুধু জান্নাতি হওয়ার প্রস্তুতি, পরকালের প্রস্তুতি।"

* জান্নাতের নেয়ামতের ঝলক পরিমাণও কারও কল্পনায় আসেনি

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আমি আমার নেককার বান্দার জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি। কোনো কান শোনেনি। কোনো মানব হৃদয়ে যার ভাব উদয় হয়নি। যদি তোমরা চাও, তবে পাঠ কর- 'কেউই জানে না, তাদের জন্য চোখ জুড়ানো নয়নাভিরাম কী কী প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে। তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ। '(সূরা সাজদাহ: ১৭)

* জান্নাতবাসীদের সৌন্দর্য সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ أَمْشَاطُهُمْ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيبِ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ

سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ

"সর্বপ্রথমে যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। তাদের পর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশে উদিত আলোকজ্বল নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বলতায় পূর্ণ। তারা প্রস্রাব-পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না এবং নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের। তাদের গায়ের ঘাম থেকে মেশকের ঘ্রাণ আসবে। তাদের ধূপদান হবে আলুওয়াহ নামক সুগন্ধি কাঠের তৈরি। তাদের স্ত্রীগণ হবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরুল ঈন। তাদের শারীরিক গঠন হবে একই ব্যক্তির ন্যায়, তাদের আকৃতি হবে তাদের পিতা আদাম আ.-এর গঠন ও আকৃতির ন্যায় ষাট হাতবিশিষ্ট। " সহীহ বুখারী: ৩৩২৭; সহীহ মুসলিম: ২৮৩৪

* জান্নাতের তাঁবু

আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ، وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّونَ ميلًا لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ، فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا

"জান্নাতে মুমিনের জন্য ষাট মাইল উঁচু মুক্তার তাঁবু থাকবে। সেখানে মুমিনের পরিবার থাকবে। মুমিন তাদের সকলের কাছে
যাওয়া-আসা করবে; কিন্তু বৃহৎ তাঁবু হওয়ার সুবাদে একে অপরকে তারা দেখতে পাবে না। "(সহীহ বুখারী: ৪৮৮০: সহীহ মুসলিম: ২৮৩৮)

* জান্নাতের গাছপালা

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةَ يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ
سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا

"জান্নাতের একটি গাছের নিচ দিয়ে কোনো অশ্বারোহী ভালোজাতের দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে একশ' বছর ভ্রমণ করেও শেষ করতে পারবে না। " (সহীহ মুসলিম: ২৮২৮)

* জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা

আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إذا دخلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الجنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا، فَلَا تموتُوا أبداً وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا، فَلَا تَسْقَمُوا أَبداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَداً وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا، فَلَا تَبْأَسُوا أَبَداً

"জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন এক আহ্বানকারী আহবান করে বলবে, তোমরা এখানে চিরজীবন বেঁচে থাকবে, কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনোই অসুস্থ হবে না। তোমাদের যৌবন অটুট থাকবে, কখনোই তোমরা বৃদ্ধ হবে না। তোমরা এখানে সর্বদা নেয়ামত
পেতে থাকবে, কখনোই বঞ্চিত হবে না। "
(সহীহ মুসলিম)

* জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

كُنَّا عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا

تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ
"আমরা একবার পূর্ণিমার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা যেমন এই চাঁদকে স্পষ্ট দেখছ, তেমনি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে দেখবে। তোমরা কোনরূপ ভিড়-ভাট্টা ছাড়াই সুস্থিরভাবে তাঁকে দেখতে পাবে। " (সহীহ বুখারী: ৫৫৪; সহীহ মুসলিম: ৬৩৩)

২৫.দুআ করা

পরকালের প্রস্তুতির আরেকটা ধাপ হলো, আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করা। মুসলিম তার প্রতিপালকের সামনে ভগ্ন হৃদয়ে কাকুতিমিনতি করে দুআ করবে, তাঁর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করবে, নেক আমলের তাওফীক চাইবে এবং নিজের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের রাস্তাকে সহজ করে দেওয়ার জন্য দুআ করবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। আমি তো সন্নিকটেই রয়েছি। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই। কাজেই তারা যেন আমার কথা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। " (সূরা বাকারা: আয়াত ১৮৬)

ঈমানের উপর অটল থাকতে নির্জনে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। যাতে দুনিয়ার জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও পরকালের অন্তিম মুহূর্তে ঈমান ও প্রশান্তির মৃত্যু নসিব হয়। তাই চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা। বেশি বেশি এ দোয়াগুলো করা-

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

উচ্চারণ: 'ইহদিনাস সিরত্বল মুসতাক্বিম। সিরত্বল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম।গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়াদ্ব দ্ব-ল্লিন।'

অর্থ: 'আমাদের সহজ সরল পথের হেদায়েত দিন। যে পথে চলা লোকদের ওপর আপনি নেয়ামত দান করেছেন। অভিশপ্ত ও গোমরাহির পথ থেকে বিরত রাখেন। (' সুরা ফাতিহা; আয়াত ৭)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

উচ্চারণ: 'রব্বানা আফরিগ আলাইনা স্ববরও ওয়া তাওয়াফফানা মুসলিমিন।'

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

উচ্চারণ : ‘রব্বানা লা তুযিগ ক্কুলুবানা বা'দা ইজ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আংতাল ওয়াহহাব।’(সুরা আল ইমরান; আয়াত ৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে-

وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ

"আপনি আমার আখিরাতকে সংশোধন করে দিন, যা আমার প্রত্যাবর্তনস্থল। আপনি প্রতিটি কল্যাণের জন্য আমার হায়াতকে বাড়িয়ে দিন।"

فاطِرَ السَّماواتِ وَالأَرضِ أَنتَ وَلِيّي فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ تَوَفَّني مُسلِمًا وَأَلحِقني بِالصّالِحينَ

‘ হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন’। (সুরা ইউসুফ, আয়াত ১০১) '

অর্থাৎ এই দুআর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর পছন্দসই ও তাঁর সন্তুষ্টির আমলগুলো করার তাওফীক প্রার্থনা করা হয়। তাওফীক প্রার্থনা করা হয় যেন প্রতিটি দিন আল্লাহর নৈকট্যলাভের আমল করার দিক থেকে আরও সমৃদ্ধ হয়।
উত্তম মৃত্যুর আরেকটি দুআ :

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ

উচ্চারন: আল্লহুম্মা ইন্নি আসআলুকা হুসনাল খ-তিমাহ।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উত্তম মৃত্যু চাই। [১/তিরমিযী ২১৪০]
এই দোয়াটি অনেক ব্যাপক। প্রিয় নবী (সা.) সুন্দর ও উত্তম তথা ঈমানি মৃত্যু লাভের জন্য এ দেয়াটি সব সময় পড়তেন।

২৬.মৃত্যুর পরেও সেসকল আমলের সাওয়াব চলমান থাকে :

জীবন ও মৃত্যু মানবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি পার্থিব হলেও অপরটি পরলৌকিক ও অনিবার্য।

মৃত্যুর আগে মানুষ যেসব আমল করবে, আখেরাতে আল্লাহ তাআলা সেগুলোর প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ তাআলা জীবন ও মৃত্যু- এ দুইটি অমোঘ-বাস্তবতা সৃষ্টি করেছেন কে কত ভাল আমল করতে পারে, তা পরীক্ষা করার জন্য

নিয়ত সঠিক-শুদ্ধ থাকলে মৃত্যুর পরও যেসব আমলের সাওয়াব পাওয়া যাবে, হাদিসের আলোকে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেওয়া হলো।

ইলম শিক্ষা দেয়া:

রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে মানুষকে ইলম শিক্ষা দিলো, এ ইলম অনুযায়ী আমলকারীর সমপরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায়ও যুক্ত হতে থাকবে।

অথচ তাদের কারো সওয়াবে কোনো কমতি হবে না। ’ (ইবনু মাজাহ, হাদিস নং : ২৪০)

সৎ সন্তান রেখে যাওয়া:

রাসুল (সা.) বলেন, ‘মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর ৪ টি আমলের সাওয়াব অব্যাহত থাকে : ১. যে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দিল তার সাওয়াব, ২. ভাল কাজ চালু করার ফলে তাকে যারা অনুসরণ করল তার সাওয়াব, ৩. যে ব্যক্তি এমন সাদাকাহ করলো, যা প্রবাহমান থাকে তার সাওয়াব, ও ৪. এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া- যে তার জন্য দোয়া করে। ’ (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং : ২২২৪৭)

মসজিদ নির্মাণ করা:

মাসজিদে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম, দ্বীনি বিষয়ক শিক্ষা দান ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মাসজিদ তৈরি করল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করবেন। ’ (মুসলিম, হাদিস নং : ১২১৮)

কোরআন বিতরণ করা :

কোনো ব্যক্তি যদি মসজিদ, মাদরাসা বা কোনো প্রতিষ্ঠানে পবিত্র কোরআন বিতরণ করে তাহলে সেগুলোর সাওয়াবের অংশ সেও পাবে। রাসুল (সা.) বলেন, ‘মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর কবরে ৭টি আমলের সাওয়াব অব্যাহত থাকে : ১. যে ইলম শিক্ষা দিল, ২. যে পানি প্রবাহিত করল, ৩. কুপ খনন করল, ৪. খেজুর গাছ লাগালো (গাছ রোপন), ৫. মাসজিদ তৈরি করল, ৬. কারো দায়িত্বে কিতাব দিয়ে গেল ও ৭. এমন নেক সন্তান রেখে গেল- যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ’ (মুসনাদুল বাজ্জার :৭২৮৯)

গাছ রোপন করা:

হাদিসে আছে, 'কোন মুসলিম যদি কোন বৃক্ষরোপন করে, আর তা থেকে কোন ফল কেউ খায় তবে সেটি তার জন্য সাদাকাহ, যদি কেউ চুরি করে খায় তাও তার জন্য সদাকাহ, কোন পাখিও খায় তাও তার জন্য সেটি সদাকাহ। এমনকি যদি কেউ তা কেটে ফেলে তাও সেটি তার জন্য সাদকাহ। ' (মুসলিম, হাদিস নং : ৪০৫০)

অভাবগ্রস্থদের ঘর-বাড়ি তৈরি করে দেওয়া:

রাসুল (সা.) বলেন, 'মুমিন মৃত্যুবরণ করার পর তার সাথে যে আমলের সাওয়াব সম্পৃক্ত থাকবে, তা হলো ইলম শিক্ষা দেয়া ও কিতাব রচনা করা, নেক সন্তান রেখে যাওয়া, মসজিদ তৈরি করা, অভাবগ্রস্থদের জন্য ঘর তৈরি করে দেয়া, পানি প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করা এবং তার সম্পদ থেকে সাদাকাহ করা। ' (ইবনু খুযাইমাহ : ২৪৯)

খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করা:

হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, এক লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তার পানির খুব পিপাসা পেল, পথিমধ্যে সে একটি কূপ পেল এবং সেখান থেকে পানি পান করল। অতঃপর দেখতে পেল একটি কুকুর পানির পিপাসায় ময়লা খাচ্ছে, তখন সে সেখানে মোজা দিয়ে পানি ভরে কুকুরকে পানি পান করাল এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! প্রাণীকে পানি পান করালেও কি সাওয়াব আছে? রাসুল (সা.) বললেন, প্রত্যেক সজীব অন্তরকে পানি পান করানোর জন্য সাওয়াব রয়েছে। ' (বুখারি, হাদিস নং : ৬০০৯)

সীমান্ত রক্ষা করা:

রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে যে কাজ সে করে যাচ্ছিল মরার পরও তা তার জন্য সওয়াব জারি থাকবে, তার রিজিকও জারি থাকবে, কবরের পরীক্ষা থেকে সে নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহ তাআলা কেয়ামতে তাকে ভয় থেকে মুক্ত অবস্থায় ওঠাবেন। ' (ইবনু মাজাহ, হাদিস নং : ২২৩৪)

অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'মৃত্যুর পর প্রত্যেক মৃতের কর্মের ধারা শেষ করে দেয়া হয়। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয় তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং কবরের ফিতনা থেকেও সে নিরাপদ থাকবে। ' (ইবনু হিব্বান, হাদিস নং : ৪৬২৪)

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া:

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং ঘোষণা করলো আমি একজন মুসলমান ' (সুরা হামিম সিজদাহ, আয়াত : ৩৩)

রাসুল (সা.) তার সাহাবাদের বলেন, 'মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করবে, এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব তার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। অথচ তাদের সাওয়াব থেকে কোন কমতি হবে না। ' (মুসলিম, হাদিস নং : ৬৯৮০)

বইপত্র/কিতাব রচনা করা

এমন বইপত্র কিংবা কিতাব রচনা করা, যার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ ও উপকার হয়। মানুষ সঠিক পথের দিশা পায়। হাদিসে এসেছে, ভাল কাজের পথপ্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে। ' (তিরমিজি, হাদিস নং : ২৬৭০)

সদকায়ে জারিয়া:

'সদকা' শব্দের অর্থ দান করা। আর 'জারিয়া' অর্থ অব্যাহত। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে শরিয়তসম্মত এমন কল্যাণকর কাজে দান করা। যেমন- মাদরাসা তৈরি, এতিমখানা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, পাঠাগারের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ করা ইত্যাদি অন্যতম। রাসুল (সা.) বলেন, 'মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে ৩ টি আমল বন্ধ হয় না, ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. এমন ইলম-যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, ৩. এমন নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। ' (মুসলিম, হাদিস নং : ৪৩১০)

২৭.মৃত্যুর সময় মুমিনের অবস্থা

হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যে সময় কোন লোকের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরলোক যাত্রা করার সময় নিকটবর্তী হয়ে থাকে, সে সময় আসমান হতে সূর্যের মত আলোকজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেস্তা বেহেস্তী কাফন ও সুগন্ধি সাথে নিয়ে যমীনে অবতীর্ণ হয়ে মৃত্যুপথযাত্রীর দৃষ্টি সীমার মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। অতপর মালাকুল মউত তার মস্তকের পাশে বসে বলতে থাকে, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও সন্তুষ্টির জন্য অতি শীঘ্র বাইরে চলে আস। তখন ঐ ব্যক্তির আত্মা স্বেচ্ছায় বের হয়ে থাকে এবং তার মুখ হতে পানির ফোটা পড়তে থাকে। তারপর তারা ঐ ব্যক্তির আত্মাকে উক্ত বেহেশতী কাফনের ভিতরে লেপটিয়ে রাখেন। আর তখন তা হতে বেহেস্তী মেশকের সুঘ্রাণ বের হতে থাকে। তারপর ফেরেস্তাগণ যখন আত্মাকে নিয়ে আসমানে গমন করতে থাকে, তখন আসমানের ফেরেস্তাগণ বলতে থাকে: এত উৎকৃষ্ট সুবাস কোথা থেকে বের হচ্ছে। এর উত্তরে ফেরেস্তাগণ বলে অমুকের পুত্র অমুকের রূহ তহতে এ সুবাস বের হচ্ছে। তখন উক্ত ফেরোমন্ডলী তাকে উত্তম নামে সম্বোধন করে থাকে। যখন ফেরেস্তাগণ আত্মা সহকারে প্রথম আকাশের শেষ সীমায় পৌছে যায়, তখনই সপ্তাকাশের সকল দরজাসূহ এর শুভাগমনে খুলে যায় এবং প্রতিটি আসমানের কতক ফেরেস্তা তার সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে যায়। এ প্রকারে সপ্তম আসমানে আরোহন করা মাত্রই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে উচ্চঃস্বরে বলা হয়ে থাকে: হে ফেরোমন্ডলী! তার আমলনামা ইল্লীয়্যিন নামক স্থানে জমা রেখে দাও এবং উক্ত ব্যক্তির রূহকে তার দেহের সাথে মিলিয়ে দাও। যেহেতু তাকে মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি এবং তাকে এ মাটিতেই ফিরিয়ে নেব এবং এ মাটি হতেই তাকে পুনরুত্থান করব। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُ كُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى.

"আমি তোমাদেরকে এ মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি, দ্বিতীয়বার এ মাটির ভিতরেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে এবং সর্বশেষ এ মাটির মধ্য থেকেই তোমাদেরকে পুনরুত্থান করিয়ে হাশরের ময়দানে হাযির করব।" (. সূরা ত্বা-হা, ৫৫)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ফেরেস্তাগণ উক্ত আত্মাকে কবরে অবস্থিত তার দেহের সাথে মিশে দেয়। তারপর মুনকার-নকীর ফেশোদ্বয় তথায় আগমন করে মৃত ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞেস করবে: হে আল্লাহর বান্দা! আপনি বলুন তো আপনার প্রতিপালক কে? আপনার নবী কে? এবং আপনার ধর্মের নাম কী? অতপর রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর দিকে ইঙ্গিত করতঃ

বলবে যে, হে আল্লাহর বান্দাহ এ মহাপুরুষ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? তখন মুমিন বান্দা সকল প্রশ্নের সঠিকভাবে উত্তর দিবে।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা অতি নিকট হতে উচ্চঃস্বরে ইরশাদ করবেন: হে ফেরেস্তাদ্বয়! আমার মু'মিন বান্দা সঠিক ও সত্য কথা বলেছে। সুতরাং তাকে বেহেস্তী পোশাক পরিয়ে দাও এবং বেহেস্তী বিছানা বিছিয়ে দাও, যাতে তার কবরের মধ্যে বেহেস্তী সুগন্ধি আসতে পারে। আর তার চোখের দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও।(বুখারী, আস-সহীহ, ৩খ., পৃ. ১৩৫০, হাদীস নং-৩৪৯০।)

আতা খোরাসানী রহ. বলেন যে বান্দা যমীনের কোন জায়গায় সিজদা করে, সে জায়গা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। ইব্ন আব্বাস রা. বলেন: কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন:

فما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

'তাদের জন্য আসমান ও যমীন কাঁদেনি, এ আয়াতের অর্থ কী? তিনি জবাব দিলেন: হ্যাঁ, আসমান যমীন কাঁদে, যত মাখলুক আছে সবার জন্যই। আসমানের দু'টি দরজা আছে। এক দরজা দিয়ে মানুষের রিযিক দেয়া হয়। আর অপর দরজা দিয়ে তার সৎকর্ম উপরে চলে যায়। অতএব, মু'মিন যখন ইন্তিকাল করে, তখন তার জন্য নির্ধারিত আসমানের উভয় দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার জন্য ক্রন্দন করতে থাকে। এমনকি যে যমীনে সে নামায পড়ত সে যমীন তার নামাযের স্থান না দেখে এবং আল্লাহর যিকির শুনতে না পেয়ে তার জন্য কাঁদতে থাকে। যেহেতু ফিরআউনের জাতির এমন কোন ভাল কাজ ছিল না, যা আসমানে যাবে, তাই এ দরজা তাদের জন্য কাঁদেনি।
. (ইবন জারীর আত-তাবারী, জামিউল বয়ান ফী তা'বীলিল কুর'আন।)

২৮.কতিপয় শুভ মৃত্যুর নিদর্শন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু শুভ নিদর্শনের কথা বলেছেন, যার কোনো একটির সাথে বান্দার মৃত্যু হলে তা শুভ মৃত্যুর দিকে অঙুলি নির্দেশ করে।

১. মৃত্যুর সময় তাওহীদের কালিমা পাঠ।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার শেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩১১৬; মুসতাদরাকে হাকিম ১/৩৫১

২. পৃথিবীতে আল্লাহ কালিমাকে সমুচ্চ রাখার জন্য শাহাদত বরণ করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) এবং (হে নবী!) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রিযিক দেওয়া হয়।

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তারা তাতে প্রফুল্ল। আর তাদের পরে এখনও যারা (শাহাদতে) তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি তাদের ব্যাপারে এ কারণে তারা আনন্দ বোধ করে যে, (তারা যখন তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবে তখন) তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণেও আনন্দ লাভ করে এবং এ কারণেও যে, আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল নষ্ট করেন না।-সূরা আলে ইমরান : ১৬৯-১৭১

৩. জিহাদের সফরে বা হজ্বের ইহরাম বাধা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে সে শহীদ। যে আল্লাহর পথে মৃত্যু বরণ করেছে সে শহীদ।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২০৬

অন্য হাদীসে আছে, ইহরামের হালতে উটের পিঠ থেকে পড়ে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে বললেন, তাকে বড়ই পাতাযুক্ত পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তার (পরিহিত) দুটো কাপড়েই তাকে কাফন দাও। তবে তার মাথা আবৃত করো না। কেননা, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উত্থিত হবে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২০৬

৪. শেষ কাজ ইবাদত-বন্দেগী হওয়া

হুযায়ফা রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং এটাই হবে তার শেষ আমল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় একদিন রোযা রাখবে এবং এটাই হবে তার শেষ আমল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সদকা করবে এবং এটাই হবে তার শেষ আমল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

-মুসনাদে আহমদ ৫/৩৯১

৫. শরীয়ত কর্তৃক সংরক্ষিত পাঁচটি বিষয়ের কোনো একটি রক্ষা করতে যেয়ে মৃত্যুবরণ করা। পাঁচটি বিষয় হল : ধর্ম, জীবন, সম্পদ, সম্মান ও বুদ্ধি।

সায়ীদ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে তার পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে দ্বীন রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ এবং যে তার জীবন রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ।-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৭৭২; তিরমিযী, হাদীস : ১৪১৮

৬. মহামারি জাতীয় কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করা এবং ছওয়াবের আশা নিয়ে মৃত্যু বরণ করা। হাদীস শরীফে এমন কয়েকটি রোগের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

ক) প্লেগ (Plague)।

আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তাউন' হচ্ছে সকল মুসলিমের জন্য শাহাদত।-সহীহ বুখারী ১০/১৬৫-১৫৭; মুসনাদে আহমদ ৩/১৫০, ২২০

খ) যক্ষা (Tuberculosis)।

রাশেদ ইবনে হুবাইশ বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুসলিমকে হত্যা করা হলে তা শাহাদত, তাউন শাহাদত, সন্তান প্রসবের সময় নারীর মৃত্যুবরণ শাহাদত এবং যক্ষা হল শাহাদত।-মুসনাদে আহমদ ৩/২৮৯

গ) পেটের পীড়া।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে কেউ মৃত্যু বরণ করলে সে শহীদ।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৯১৫

ঘ) যাতুল জাম্ব (ফুসফুসের একটি বিশেষ ব্যাধি (Pleurisy)।

জাবির ইবনে ওতাইক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যাতুল জাম্ব' রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

৭. সন্তান প্রসবের সময় ও নেফাস অবস্থায় নারীর মৃত্যু।

উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-সন্তান প্রসব করতে গিয়ে নারীর মৃত্যু হলে তা শাহাদত। তার সন্তান তাকে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। ... -মুসনাদে আহমদ ৪/২০১, ৫/৩২৩

৮. পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে কিংবা ভূমি ধ্বসে মৃত্যু।

৯. জুমআর দিন বা রাতে মৃত্যুবরণ করা।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলিম শুক্রবার দিনের বেলা কিংবা রাতে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের ফেতনা থেকে মুক্তি দান করেন।-মুসনাদে আহমদ ২/১৬৭; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১০৮০

১০. মৃত্যুর সময় কপাল ঘর্মাক্ত হওয়া।

হোসাইব থেকে বোরায়দা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমানদার মৃত্যু বরণ করে কপাল ঘর্মাক্ত অবস্থায়।-তিরমিযী, হাদীস : ৯৮২; সুনানে নাসায়ী ৪/৬

এছাড়াও আরো কয়েকটি উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হল, যা শুভ মৃত্যুর উপলক্ষ হয়ে থাকে।

ক) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা। কারণ এটিই মুক্তির পথ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) হে মুমিনগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেইভাবে ভয় কর যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। সাবধান অন্য কোনো অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে; বরং এই অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলমান।-সূরা আলে ইমরান : ১০২

প্রত্যেকের উচিত গুনাহকে ভয় করা এবং তা থেকে দূরে থাকা। কারণ কবীরা গুনাহ তো মানুষকে ধ্বংস করে দেয় আর সগীরা গুনাহ বার বার করা হলে তা কবীরায় পরিণত হয়। সগীরা গুনাহয় লিপ্ত থাকলে তা অন্তরে কালিমা সৃষ্টি করে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে সকল গুনাহকে তুচ্ছ মনে করা হয় তোমরা তা থেকে দূরে থাক। (গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করার দৃষ্টান্ত হল) একটি কাফেলা কোনো উপাত্যকায় যাত্রা বিরতি করল। এরপর একজন একটি লাকড়ি সংগ্রহ করে আনল, অন্যজন আরেকটি আনল (এভাবে পর্যাপ্ত লাকড়ি একত্র হল) এবং তারা রুটি সেঁকে প্রস্তত করল।

তো (এভাবেই) ছোটছোট গুনাহ যখন ব্যক্তিকে একত্রে পাকড়াও করবে তখন তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।-মুসনাদে আহমদ ৫/৩৩১

খ) সর্বদা আল্লাহর যিকির করা। যে সর্বদা আল্লাহর যিকির করে, যিকিরের মাধ্যমে তার সকল কাজ সমাপ্ত হয় এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় তার যবানে উচ্চারিত হয়-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুসংবাদ লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার শেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩১১৬; মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৫১

হাসানের সূত্রে সায়ীদ ইবনে মানসুর বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম আমল কী? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মৃত্যু দিবসে তোসার জিহবা আল্লাহর যিকিরে সজীব থাকা।-আলমুগনী ২/৪৫০

হে আল্লাহ! আমাদের সর্বশেষ আমল যেন হয় আমাদের সর্বোত্তম আমল এবং আপনার সাথে মোলাকাতের দিন যেন হয় আমাদের শ্রেষ্ঠ দিন। আর আমাদেরকে শামিল করুন ঐসব লোকদের মাঝে যাদের প্রতি আপনার নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে, যাদেরকে আপনি স্থান দিয়েছেন জান্নাতে, আপনার নৈকট্যের স্থানে।

২৯.মৃত্যুকালে শয়তানের ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষার উপায়

মৃত্যুকালে শয়তানের ধোঁকা থেকে নিরাপদ থাকা এবং দ্বীনের উপর ইস্তিকামাত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর হাদীস ও কুর'আনের আয়াত থেকে কিছু উপায় জানা যায়। যেমন:

প্রথম উপায়: ঈমান গ্রহণের উপর অটল থাকা।

দ্বিতীয় উপায়: ঈমানের উপর ইস্তিকামাত থাকা। এ দু'টো উপায় কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

তৃতীয় উপায়: গোসল ফরয অবস্থায় গোসল করতে দেরি হলে কমপক্ষে সাথে সাথে অযু করে নেয়া। তাও সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করে নিবে।

চতুর্থ উপায়: স্বীয় আত্মা, পোশাক ও ঘরকে এরকম বস্তু থেকে পবিত্র রাখা, যার কারণে রহমতের ফেরেস্তা ঘরে ঢুকে না। যেমন ফটো, কুকুর, গোসল ফরযকারী মানুষ, ঐ সকল অলংকার যাতে আওয়াজ হয় ইত্যাদি। (মাশারেকুল আনওয়ার, পৃ. ১০)

পঞ্চম উপায়: পিতা-মাতার কথা মান্য করা। হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি মহানবী

সা.-এর খিদমতে হাযির হয় আরজ করল হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমাদের এলাকায় একটি ছেলে মৃত্যুমুখে পতিত, তাকে কালেমা পড়তে বলা হলে সে পড়তে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন সে পূর্ব থেকেই কি তা বড়তে অভ্যস্ত নয়? লোকেরা আরজ করল হে আল্লাহর নবী। সে আগে সব সময় কালেমা পড়তে পারতো কিন্তু এখন পারছে না। তখন ছেলেটির পাশে রাসূলুল্লাহ্ সা. নিজেই তাশরীফ আনলেন এবং তাকে তালকীন করলেন। কিন্তু সে বলল: কালেমা পড়ার মত কোন শক্তি আমার নেই। মহানবী সা. বললেন: কেন? সে বলল: আমি আমার মায়ের কথা শুনতাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সা. তার মায়ের নিকট থেকে তার ভুল-ক্রটি ক্ষমা করালেন, তারপর তার মুখ খুলে গেল এবং কালেমা তাইয়্যেবা পড়ে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। (নুরুস সূদূর)

ষষ্ঠ উপায়: মৃত্যুর সময় অন্যান্য লোকদের মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে কালেমা তালকীন করানো।

৩০.উপসংহার:

জীবনের সময়টুকুই একজন মানুষের ইহকালীন মূলধন। যদি তা আখেরাতের কল্যাণের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয় তবেই ব্যবসা সফল হবে। আর যদি তা বিনষ্ট করা হয় গুনাহ ও পাপাচারে এবং এ অবস্থায় আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাত হয় তাহলে সে হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। তাই বুদ্ধিমান সে-ই, যে নিজের হিসাব নেয়, আল্লাহ তার কাছ থেকে হিসাব নেওয়ার আগে এবং গুনাহ ও পাপাচার থেকে দূরে থাকে তা তাকে ধ্বংসের পথে নেওয়ার আগেই।

“ যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালোবাসেন আল্লাহ তাদের সাক্ষাৎ ভালোবাসেন আর যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালোবাসেন না আল্লাহও তাদের সাক্ষাৎ ভালোবাসেন না ।” (সহিহ বুখারী; ৬৫০৮)

আজ আমাদের সামনে দুটোপথ খোলা। এক. প্রবৃত্তি বা শয়তানের পথ। আর দুই. খোদাভীতি বা দয়াময়ের পথ। সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে। আজ যে পথ বেছে নেবো সেটাই হবে গন্তব্য। এটা কখনোই সম্ভব নয়; পাপাচারে জীবন কাটবে আর মৃতুর সময় বায়জিদ বোস্তামি আর জোনায়েদ বাগদাদির মতো মৃত্যু হবে। কারণ রাসুল (সা) বলেছেন-

كَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ

"জীবন যেভাবে কাটবে মৃত্যুও সেভাবে হবে।”

আর যেভাবে তোমাদের মৃত্যু হবে সেভাবেই তোমাদের জীবিত করে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে। যে ঢংয়ে জীবন কাটিয়েছো সে ঢংয়েই মৃত্যু আসবে। তাই জীবনের গতি বদল করে নিতে হবে। নেককারের জীবন বেছে নিতে হবে। এটা কয়েকদিনের ব্যাপার মাত্র। এরপরই আমাদের সামনে সৌভাগ্যের দুয়ার খোলা হবে।সৌভাগ্যবান ওইব্যক্তি, যে নেককাজ ও খোদাভীতির জীবন কাটায়। মরণের সময় তাদের সামনে চিরস্থায়ী খুশির দরোজা খোলা হয়। আল্লাহ আমাদের ইসলামের উপর জীবন কাটানো তৌফিক দিন! ইমানের সাথে মরণ দিন!! পরের ঘাটিগুলো সহজ করে দিন!!!

وَمَا ذُلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

“এটা আল্লাহর জন্য একদম সহজ।”

<u>**রেফারেন্স**</u>

সহায়ক গ্রন্থ :

- অন্তিম মুহূর্ত (লেখক- শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম)
- পরকালের প্রস্তুতি (লেখক- শাইখ খালিদ আল হুসাইনান রহ.)